পারাবত

পারাবত

সন্তোষকুমার ঘোষ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

পারাবত

সংকলিত গল্পগুলির কিছু নতুন, কিছু পুরোন। দু' একটিতে, যথা 'পারাবত' এবং 'স্বয়ম্বরা', বিদেশী প্রভাব আছে। এ-কথা পূর্বে কবুল করিনি, গ্রন্থপ্রকাশের সুযোগে করলুম।

দিল্লী
৭ই পৌষ, ১৩৬০

সন্তোষকুমার ঘোষ

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

পারাবত

রাত্রিশেষে স্থলতার ঘুম ভেঙে গেল;—সেই ফিস্-ফিস্ শব্দ। মুখ থেকে কম্বলটা সরিয়ে জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল,—এ একেবারে নতুন দেশ।

সুজলা সুফলা বাংলার চিহ্নটুকুও অবলুপ্ত। কোথায় সেই ঘন-গুল্ম, রেলওয়ে লাইনের ওপর নুয়ে-পড়া বনস্পতির লুকোচুরি। গাড়িটা এখন চলেছে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে,—বিধবার দেহাবরণের মত তার দিগন্তরেখায় পাড়ের সবুজটুকুও নেই।

কখনো কখনো অতি-দূরে এক একটা উন্নতশির তালগাছ, কখনো বা মেঘের কোলে ক্ষীণ সুর্মারেখার মত অচেনা একটা পাহাড়। আর সারা প্রান্তর ভরে শুয়ে আছে রজত-জ্যোৎস্না।

গাড়িটা একটা কালভার্টের ওপর উঠতেই চাকায় চাকায় নতুন একটা স্বর বেজে উঠল। একটানা একঘেয়ে গজল টপ্পার পর অকস্মাৎ ধ্রুপদ আলাপের মত। কিন্তু সেই শব্দকেও ছাপিয়ে উঠছে ফিস্-ফিস্ শব্দ। ওরা কি সারা রাত একেবারে ঘুমোয়নি?

স্থলতা একবার মাথা তুলে চার ধারে চেয়ে দেখল,—সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। পরিতৃপ্ত নিদ্রার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের একটা ঐকতানও সাবধানে কান পাতলে বুঝি শোনা যায়। চাকায় চাকায় সঙ্গীত, শিকলে শিকলে তারি সাথে সঙ্গত, আর সব ছাপিয়ে সেই ফিস্-ফিস্ আলাপ। সামনের বার্থ দুটো একেবারে খালি। ওরা উঠে গেছে।

উঠে গেছে জানালার ধারে,—জ্যোৎস্না-স্নাত বহির্বঙ্গের গৈরিক শোভা দেখছে। চাঁদের আলোয় ওদের প্রলম্বিত ঘনিষ্ঠ ছায়া দু'টো এসে পড়েছে স্থলতার বিছানায়, আর ওদের সংলগ্ন ওষ্ঠ দু'টির পরিভাষাও এসে পৌঁছচ্ছে স্থলতার কানে। ওদের কি লজ্জা নেই।

হঠাৎ স্থলতা একবার কেশে উঠল—বুকের ব্যথাটা আবার বেড়েছে। কিম্বা সে কাশির অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল বুঝি। ওদের সচকিত করে দেবার দুষ্টুমি। আছি, আমি আছি। স্থলতা জেগে আছে।

কিন্তু আশ্চর্য, ওদের স্বতন্ত্র হতে দেখা গেল কই। একটু সরে দাঁড়াল সিপ্রা আর সিতেশ, কিন্তু ওদের মুখ দু'টি এক হয়েই রইল।

—সরে গেলে যে!

—কে যেন জেগেছে।

—কে আবার, ওই নিচের বার্থের টি. বি.-ওয়ালা মেয়েটা।

—ওর কি ঘুম নেই?

—আমাদেরই কি আছে?

নিশ্বাস রোধ করে শুয়ে আছে স্থলতা, ওদের আলাপের প্রতিটি অক্ষর ওর হৃদয়ে হাতুড়ি হানছে। একটু আস্তে আস্তে কথা বলে না কেন ওরা।

—সত্যি আজ রাত্রে একটুও ঘুমোইনি, না?

—কবেই বা তুমি ঘুমোতে দিয়েছ?

—বেশ তো ফের গিয়ে শুয়ে পড় না গো। এখনও রাত আছে। আমি তো একলাই উঠে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি উঠে এলে কেন?

বোঝা যায় এ কলহ কপট। স্তম্ভিত হয়ে স্থলতা শুনছে। বুকের পাঁজরে পাঁজরে একটা রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে। কাণ দু'টো লাল, অশ্লীল রচনা পাঠের রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা বোধ করছে স্থলতা। ওদের কথা কি ফুরোয় না।

—কই শুতে গেলে না?

—আর গিয়ে কি হবে, রাত পুইয়ে এসেছে। অর্থাৎ রাত কিছু বাকি থাকলে ওরা যেন আর জানালার ধারে দাঁড়াত না, সুবোধ বালক-বালিকার মত যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে শুয়ে ঘুমাত।

—কী স্টেশন গেল বল্ তো।

—মধুগঞ্জ।

—কী করে পড়লে? আমি তো অনেক চেষ্টা করেও পড়তে পাচ্ছি না, ঝাপ্‌সা অক্ষরগুলো পিছলে যাচ্ছে।

তাব পর ওরা এক মধুব খেলা পেয়ে গেল। স্টেশনের নাম পড়া। সাহাপুর। হ'ল না শ্যামপুর। এটা গেল ফল্গুঘাট। কে বলেছে? আমি স্পষ্ট দেখলাম। অতো কষ্ট করে পড়ে দেখে লাভ কি? টাইম-টেব্‌ল দেখলেই হয়।

টাইম-টেব্‌ল দেখলে হয় বটে, কিন্তু খেলা হয় না।

দ্বিতীয় বার যখন স্থলতার ঘুম ভাঙ্গল তখন বেলা অনেক। সারা আকাশ রৌদ্রস্নান করছে, আর সে কী প্রখব রোদ! এ দিকের জ্যোৎস্না যেমন হিম, রোদ তেমনি প্রখর।

কী একটা স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, বাইরের সোর-গোলেই তা বোঝা যায়। বোধ হয় বড় কোন জায়গা হবে। সুলতা উঠে বসল।

এটা কোন্ স্টেশন বাবা।

হরিপ্রিয় খবরের কাগজ পড়ছিলেন,—মেয়ের কথায় সস্নেহে তাকালেন। ঘুম ভাঙল? '—নগর।' আজ স্পেশালটা এখানেই থাকবে। ছাড়বে সন্ধ্যার পর। এখানে ঐতিহাসিক কতগুলো দেখবার জিনিস আছে। প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

মুখ ধুয়ে ফিরে এসে সুলতা দেখল চা তৈরি। রক্ষিত-সাহেবের ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। সব ঘড়িমাফিক চলেছে। চায়ের সঙ্গে এসেছে খান দুই তাজা রুটি, মাখন, জ্যাম আর ডিম। প্রাতরাশ।

গাড়িশুদ্ধ সবাই জেগেছে দেখা গেল। ওধারের বার্থের সেই মারোয়াড়ী বাবুটি এরই মধ্যে স্নান সেরে নিয়েছেন। সঙ্গের চিড়িয়াটিকে এক হাতে ছোলা-ছাতু খাওয়াচ্ছেন আর পাশের লোকগুলিকে বলছেন—ঘিউয়ের দাম চড়বে না? জরুর চড়বে। কারবার আমি অনেক করেছি বাবুসাব—কাঠ লোহা তেল সব কিছু, কিন্তু ঘিউর' মত মুনাফা কিছুতে পেলুম না।

এ ধারের ভদ্রলোক দু'জন গল্প করছেন।

—যাই বলো, এদের এ্যারেঞ্জমেণ্ট কিন্তু চমৎকার। গুণে দু'শো টাকা নিয়েছে, কিন্তু ফাঁকি দেয়নি। দু'শো টাকায় গোটা ইণ্ডিয়াটা ঘোরা হ'ত? আর এমন খানা? বাড়িতে খাইতো পুঁই চচ্চড়ি আর সজনের ডাঁটা—এখানে তো রীতিমত রাজভোগ।

একটু দূরে অবগুণ্ঠনবতী একটি মহিলার সামনে এক ভদ্রলোককে কাকুতি মিনতি করতে দেখা গেল।

এদের ছোঁয়া যদি খাবে না, তবে এলে কেন? এখন তোমাব জন্যে আলাদা বান্নাব ব্যবস্থা কবি কি কবে বল তো? ওসব 'শুচিবাই' কলকাতায় ফিবে গিযে ক'বো বোযেচ,—২৩ নম্বব হরলাল মল্লিক লেনেই ওসব খাটে, নাও, ধব।

অবগুণ্ঠনবতী কী বললেন শোনা গেল না। কেবল সবেগে আন্দোলিত অবগুণ্ঠনে দৃঢ অস্বীকৃতিব আভাস পাওয়া গেল।

—কী মুশ্‌কিলেই পডা গেল। তখন যে খুব তীর্থ দেখব বলে লাফিয়ে উঠে বেবিয়ে এলে,—এসব খেয়াল তখন ছিল না?

—নো ট্রাম্প্‌স্‌

—টু স্পেড্‌স

—থ্রি হার্টস

—ডবল।

একধাবে ক'টি ছেলে তাস খেলছে। খুব সম্ভব পবীক্ষা দিযে বেরিয়ে পডেছে।

—যাই বলিস গাডিখানা এল কিন্তু খুব। তু'ঘণ্টায় সাডে তিনশো মাইল।

—ঘোডার ডিম। আমেরিকাতে একখানা এক্সপ্রেস আছে—

—ওই দেখ্‌ শালা আবাব পট্টি শুরু কবলে। এবার কী দিবি, দে। নীচেব হাত থেকে 'কুইন' খেলেছি।

—God save the king.

—কাল বাতে ঘুমিয়েছিলি?

—খু-উ-ব। খালি শেষ বাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

—কিছু শুনতে পেয়েছিলি ?

—শুনিনি আবার ? ফিস্‌-ফিস্‌-প্রেমালাপ তো ? মাইরি, ওরা দু'জনে জমিয়েছে খাসা। কপোত-কপোতী। নইলে এই দূর দেশে পাড়ি জমান বেকার হয়ে যেত।

সুলতা বাইরে চেয়ে দেখল,—লাল কাঁকর-ছাওয়া প্ল্যাটফরমের উপর সিতেশ আর সিপ্রা দাঁড়িয়ে।

মাথায় ঠিক পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, পরনে চমৎকার ব্লেজারের স্যুট। গলা-বন্ধটার রঙটাও জামার সঙ্গে মিলেছে রাজযোটক। সিতেশকে ভারি সুন্দর লাগছে। দু'ঠোঁটের ভিতর সিগারেটটা নিখুঁৎ কৌশলে বন্দী। সিপ্রার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। এক মুহূর্তের জন্যেও আলাদা হবে না, ওদের প্রতিজ্ঞা কি এই।

সন্ধ্যার পর আবার ট্রেণ ছাড়ল। আবার সেই চাকায়-জড়ান একঘেয়ে কান্না, ঘন ঘন উচ্চকিত হুইসল, আর সব কিছুর ফাঁকে ফাঁকে নবদম্পতির গুঞ্জন। সিতেশ আর সিপ্রা।

সিতেশ এখন পরেছে বাঙালীর ধুতি, পাঞ্জাবি আর চাদর। ঢেউ-তোলা চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিয়েছে। ওরা দু'জনে টুল নিয়ে বসেছে যথারীতি জানালার ধারে। আর ওদের খণ্ড খণ্ড আলাপ সবার কানেই এসে পৌঁছচ্ছে। সুলতা একদৃষ্টে সিতেশের দিকে চেয়ে ছিল।

হেসে হেসে সিতেশ সিপ্রাকে কী যেন বোঝায়, শুনে সিপ্রার আর হাসি থামে না। হেসে হেসে গড়িয়ে পড়বে না কি সিতেশের গায়ে ? এই এক-ঘর লোকের সামনে ? গাড়িশুদ্ধ লোকের যে ওদের উপরেই দৃষ্টি, সে খেয়াল কি নেই ?

বাথরুমে গিয়ে দেয়ালের আয়নাটার দিকে তাকাতেই স্থলতার মুখে করুণ হাসি ফুটে উঠল। নিজেকে বলল, হে হরিপ্রিয় চৌধুরীর আত্মজা, ঈর্ষান্বিত হয়ো না। নিজের আননশ্রীর সঙ্গে একবার সিপ্রার তুলনা কর। বিশ বছরেই তুমি বুড়িয়ে গেছ, গণ্ডদেশে এক ফোঁটা মাংস নেই চেহারায় স্নিগ্ধতা এনে দিতে, কোটরগত চোখ দু'টিতে বিদ্যুৎই বা কই। কুড়ি বছরেই তোমার দেহ কাল রোগে জীর্ণ, সবাই আশঙ্কা করছেন টি. বি.। মন সারাতে বাবার সঙ্গে দেশভ্রমণে বেরিয়েছ, বেরিয়ে ফিরে যাও, মিছিমিছি মন খারাপ কর না। চোখেমুখে জল ছিটিয়ে স্থলতা বেরিয়ে এল।

খাবারঘরে টেবিলের সমুখে সিতেশ সে দিন ম্যাজিক দেখালে। কত রকম আশ্চর্য খেলাই যে সিতেশ জানে। তাসের ভাঁজে ভাঁজে কৌশল। তুড়ি দিয়ে একবার সব উড়িয়ে দিলে।

এ-খেলা আগেও সবাই দেখেছে,—কিন্তু নতুন করে বিদেশে, বিশেষ চলন্ত ট্রেণে, সকলেরই অদ্ভুত লাগল।

পরদিন গাড়ি এল প্রাদেশিক একটা রাজধানীতে। প্রাচীন সহর, তার উপর নতুনের প্রলেপ লেগেছে। ইংরেজের রচনা যেটুকু, তা খটখটে ঝক্‌ঝকে ;—এরি মাঝে মাঝে বড় রাস্তার পিছনে ভগ্নস্তূপ—কিম্বা কঙ্কালসার ইমারত,—দাঁত বারকরা হাসির মত কুরূপ।

সিতেশ চেনে সব। সে নিজেই সবাইকে সব কিছু দেখিয়ে নেয়,—রক্ষিতের গাইড বেচারা চলে পিছু পিছু।

—ইনসিওরেন্সের এজেন্সী করি,—গোটা ভারতবর্ষ ঘুরতে হয়েছে মশাই,

তবু এবারে বেরিয়ে পড়তে হ'ল। নতুন বিয়ে কি না। বলে অলক্ষে সিপ্রার দিকে চেয়ে কটাক্ষ করে। সিপ্রার মুখে একটা নবারুণ শোভা দেখা দেয়।

পুরনো একটা ঝিল ছিল। সেখানে ওরা সন্ধ্যা উদ্‌যাপন করলে। বয়স্করা আগেই গাড়িতে ফিরে গেলেন। ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কা। স্থুলতা রয়ে গেল সকলেরই সঙ্গে। সিতেশের কী যেন যাদু আছে। ঝিলের পিছনে ঝাউ গাছের চূড়ায় খানিক বাদে চাঁদ উঠল। পাতায় পাতায় হাওয়ার অবিরাম কানাকানি।

সিপ্রা সেখানে বসে পর পর তিনখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে। সিতেশ বাজালে বাঁশি।

এ একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ। নতুন দেশ দেখার আনন্দকে ছাপিয়ে উঠেছে কপোত-মিথুনের কাকলি। উজ্জ্বল আলাপে, রাজনীতি আলোচনার আবর্তে, প্রণয় গুঞ্জনের প্রলাপে,—সর্বত্রই রয়েছে সিতেশ। নিমন্ত্রণবাড়ীর কর্তার মত সবাইকেই আপ্যায়ন করে চলেছে। কখনো সে হরিপ্রিয়ব সঙ্গে রাজনীতির গভীর আলোচনায় মত্ত। কখনো মারোয়াড়ীটিকে ব্যবসার সব গোপন পথের হদিশ দিচ্ছে। লোকটা এতও জানে।

পরদিন যে জায়গাটিতে গাড়ি এল তার মূল্য প্রাগৈতিহাসিক। ভূগর্ভ খুঁড়ে তিন হাজার বছর পুরনো ইতিহাসের অস্থি পাওয়া গেছে। স্থাপত্যের যে সব নিদর্শন দেখা গেছে তা প্রাক্‌বৌদ্ধযুগের, অবলুপ্ত শিল্পশ্রী আবার লোকলোচনের সমুখে এসে অভিবাদন জানাচ্ছে।

কথা ছিল, এখানে ওরা চড়ি-ভাতি করবে, সারাদিন খেটে খুটে সিতেশই সব জোগাড় করে দিলে। সে নিজে সব জানে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে

সেই প্রেতনগরীব লুপ্ত ঐশ্বর্যেব চিহ্ন দেখালে। তাব পব খেতে বসবাব সময় তাকে আব দেখা গেল না।

সিপ্রাকেও না। দু'জনে মিলে হয়ত গিয়ে বসেছে কোন পাথরের উপবে। সব চোখের অন্তবালে ওদেব প্রণয়পীডিত হৃদয় দু'টি হয়ত পরস্পবেব সন্নিহিত হয়ে এসেছে।

ওদেব পাওয়া গেল বাত আটটার পব। সকলে তখন গাড়িতে ফিরে এসেছে। দেখা গেল, দূব থেকে বেলওয়ে লাইনেব ওপর দিয়ে ওবা আসছে হাত-ধবাধবি কবে।

—বেশ লোক মশাই। আপনাদেব জন্যে বসে বসে—একসঙ্গে অসংখ্য কণ্ঠে অভিযোগ উঠল।

বিনীত মধুব কণ্ঠে সিতেশ সবার কাছেই মার্জ্জনা চাইলে। একটু ওদিক্‌টা দেখতে গিযে দু'জনে মিলে পথ হাবিয়ে ফেলেছিলুম। তাই দেরি হ'ল। ইচ্ছে কবে সিতেশবা পথ হাবিয়েছিল কি না, তা বললে না, কিন্তু সকলেব মুখেব কৌতুকে আব স্বল্পোচ্ছাবিত হাসিতে সেটা আব উহ্য রইল না।

আবাব গাডি ছাডল। কখনো উন্মুক্ত প্রান্তবে, কখনো পাহাড়ের সুডঙ্গ-পথে, কখনো বা অবণ্যেব ভিতবে সর্পিল গতিতে। টেলিগ্রাফেব তাবে তাবে একটা বৈবাগী আলাপ,—আব চাকায চাকায় চেনটানা শিকলে, ইঞ্জিনেব হুইসলে, সেই অপরূপ অর্কেস্ট্রা।

আব মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙলে শোনা যায়,—দু'টি কামনা-কোমল হৃদয পবস্পবেব কানে কানে কী নিবেদন কবছে। সিতেশ আব সিপ্রা। সেই ফিস্‌-ফিস্‌ আলাপ। গভীব বাত্রে ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দেব মত ওদেব অবিচ্ছিন্ন কাকলি।

ভারি মধুর লাগে। রক্ষিতের এই স্পেশাল,—যারা দু'শো টাকায় গোটা হিন্দুস্থান দেখাবে বলে নানা জাতের সব লোক জড়ো করেছে,—ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-বিধবা,—ছাত্র-কেরানি থেকে বিজনেসওয়ালা, সেখানে এসে যে এই অদ্ভুত আশ্চর্য নবদম্পতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, এ কথা কে জানত। দেশভ্রমণের শ্রান্তিটুকুও আর থাকে না। গায়ে আতর ঢেলে বেড়াতে বেরোনোর মত সর্বক্ষণ একটা সুরভিত অনুভূতি চেতনাকে ছেয়ে থাকে।

ঠিক পাঁচ বছর পরে ভারতেব কোন শৈলাবাসের বিখ্যাত একটা হোটেলে দেখা গেল হরিপ্রিয় চৌধুরীর মেয়ে সুলতাকে। সুলতা এখানে স্বাস্থ্যেব সন্ধানে এসেছে।

এই পাঁচ বছরে সুলতাব চেহাবায় কি কোন পবিবর্তন দেখা গিয়েছে। কিছু মাত্র না। কেবল আবো একটু বোগা হয়েছে সুলতা, প্রবিষ্ট চোখের কোলে আরো গভীর কালো বেখা পড়েছে, তাব ক্ষতিপূবণ কবতে সুলতা বুঝি পাউডার, স্নো, নানা প্রসাধন উপচারের ববাদ্দ বাড়িয়ে দিয়েছে। বছরের বেশির ভাগ কাটে বিভিন্ন শৈলাবাসে, নয় তো সমুদ্রতীবে। হবিপ্রিয় খরচের ত্রুটি করছেন না। ডাক্তারবা সন্দেহ কবেন ক্ষয় বোগ।

সুলতার ডায়েরি থেকে :—

১৫ই মার্চ—দু'দিন হ'ল এখানে এসেছি, কিছুই ভাল লাগছে না। সেই দেবতাত্মা হিমাচল,—পাহাড়ে সূর্যোদয়, কিন্তু কিচ্ছু ভাল লাগছে না। প্রাকৃতিক শোভা অনেক দেখেছি, ওতে আর রুচি নেই।

১৭ই মার্চ—আজ অনেক দিনের পুরনো এক চেনা ভদ্রলোককে দেখলাম যেন। সিতেশ বাবু। পাঁচ বছর আগে "রক্ষিতের স্পেশালে" আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। সিতেশ আর সিপ্রা। সেই একটি মাস ট্রেনশুদ্ধ সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। সিতেশ বাবু কি আমাকে চিনতে পারেননি। নইলে আমার নমস্কারের প্রতিদান করলেন না কেন? —(এখানে গোটা কতক লাইন কেটে ফের লেখা আছে)—অবশ্য সিতেশ বাবুর ব্যবহারে আমি আঘাত পাইনি। জীবনে একে একে অনেক পুরুষকেই আমার ভাল লেগেছিল,—কিন্তু আমাকে কারুর ভুলেও ভাল লাগেনি। টি. বি. ছাড়া আর কেউ আমার প্রেমে পড়ে নি। আহা বেচারা! এত ভালবেসেছে যে আর ছাড়তে চাইছে না।

১৮ই মার্চ—সিতেশ বাবু দেখছি আমার পাশের কামরাতেই থাকেন। কিন্তু একটি জিনিসে ভারি খটকা লাগছে, সিপ্রা কোথায়? আরেকটি মেয়েকে সিতেশবাবুব ঘরে দেখতে পাই,—কিন্তু সে সিপ্রা নিশ্চয় নয়। সিপ্রা এর চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল। আর এ মেয়েটিরও কি চেহারা কি চালচলন হাবভাব কোনটাই সিপ্রার মত অতটা প্রীতিপ্রদ নয়। সিপ্রা কি মারা গেছে। কিন্তু সিতেশ বাবু ফেব বিয়ে করলেন কবে? সিতেশ বাবুর চেহারাতেও আগের জৌলুষ নেই। পাঁচ বছরে যেন আমার চেয়েও বুড়িয়ে গেছেন। আগের মতই স্যুট-টাই পরছেন বটে, কিন্তু সে অতি খেলো রঙের, শস্তা কাপড়ের। কখনো বা ছেঁড়া।

১৯শে মার্চ—প্রকৃতি কিন্তু সিতেশ বাবুর বদলায়নি। তেমনি সবাইকে নিয়ে জমাতে (মজাতে নয় তো?) ভালবাসেন। আজ আবার খাবাব ঘরে তাসের ম্যাজিক দেখালেন। সেই পুরনো খেলাগুলোই। কিন্তু ভদ্রলোকের

সে নৈপুণ্য আর নেই। কতগুলো খেলা আনাড়িও ধবে ফেলে দেবে। ওঁব কথায় লোক আজও হাসে বটে, কিন্তু সে হাসি যেন কতকটা করুণাব।

২০শে মার্চ—সিতেশ বাবুব আরো একটা অভ্যাস যায়নি দেখছি। আজ সন্ধ্যাবেলা পশ্চিমেব বারান্দাব কোণে দাঁড়িয়ে নতুন বৌকে আদর করছিলেন। কী বিশ্রী। ওই কালো ধুমসো মেয়েটাকে ভালবাসা জানাতে ভদ্রলোকেব রুচিতেও বাধে না। তাছাড়া হোটেলের সবাই আড়াল থেকে দেখেছে। সকলকে দেখিযে প্রেমালাপ কবাব অভ্যাস সিতেশ বাবুব ভাবি বিশ্রী।

*　　*　　*　　*　　*

২১শে মার্চ—সিতেশ বাবুকে এখানে সবাই দেখছি পরিমল বাবু বলে। ভদ্রলোক নাম ভাঁড়ালেন কেন।

২২শে মার্চ—আজ বাবা এসেছেন। বাবাব কাছে একটা চাঞ্চল্যকব খবব শুনলাম আজ। বাবা এসেই বললেন, তোকে এই হোটেল ছাড়তে হবে।

সবিস্ময়ে বললাম,—কেন?

নীচু স্বরে বাবা বললেন,—এ হোটেলটা ভাল নয। ওই যে সিতেশ চৌধুরী আব ওই মেয়েটি, ওরা—স্বামী স্ত্রী নয। কলকাতায় কথায কথায আমাব এক বন্ধুব কাছে জেনেছি। সিতেশ এই হোটেলে চাকবি কবে, আর ওই মেয়েটিও।

—হোটেলে চাকরি? কী চাকবি কবেন সিতেশ বাবু এখানে।

বাবা সসঙ্কোচে বললেন,—ওদেব কাজ,—কেবল পবস্পবকে প্রেম নিবেদন করে যাবে। হোটেলে এই ধবণেব এক জোড়া থাকলে হোটেলেব খদ্দেব বাড়ে। এটা ব্যবসাব একটা নতুন টেক্‌নিক।

—প্রেমের পেশা? আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। 'রক্ষিতের স্পেশালের' সেই সিতেশ বাবু? আর সেই সিপ্রা?

—রক্ষিতের স্পেশালেও ওদের ওই কাজ ছিল। সিপ্রাও সিতেশের স্ত্রী ছিল না। ট্রেনে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্যেই কোম্পানী ওকে রেখেছিল। সিপ্রা মেয়েটা চালাক। দু'দিন বাদে সিনেমা কোম্পানীতে ভাল একটা চান্স নিয়ে সরে পড়েছে। সিতেশ বেচারা সুবিধে করতে পারেনি। কিছু দিন বেকার থেকে কোথা থেকে ফের ওই মেয়েটাকে জুটিয়ে এখানে এসেছে। এখানেও ওর ওই চাকরি, বাবা বললেন।

এই সংসর্গে এর পর আর থাকা চলে না। বাবা কালই আমাকে নিয়ে কলকাতা যাবেন বলেছেন। সিতেশ বাবুকে ঘৃণা করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

২৩শে মার্চ—আজ কী খেয়াল হয়েছিল জানি না, সিতেশ বাবুকে ডেকে সব কথা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। প্রথমে ভদ্রলোক একটা হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে আমাব দিকে চেয়ে রইলেন—দৃষ্টিতে তেজ থাকলে বুঝি দগ্ধ হয়ে যেতাম। তার পর ধীরে ধীরে তাঁর চোখে একটা কাতরতা ফুটে উঠল,—সারা মুখ ম্লান হয়ে গেল। টেবিলের ওপর মাথা রেখে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে বইলেন,—তারপর আস্তে আস্তে বললেন,—আপনি যা শুনেছেন কাউকে বলবেন না মিস চৌধুরী। একে একে সিতেশ বাবু ওঁর জীবনের অনেক কথাই বলে গেলেন—যুদ্ধের দরুণ রক্ষিত কোম্পানী উঠে যাওয়া থেকে শুরু করে সিপ্রার সিনেমাতে চলে যাওয়া পর্যন্ত। এ মেয়েটিকে সংগ্রহ করেছেন কলকাতার ইতর একটা পাড়া থেকে,—কিন্তু ওকে নিয়েই চালাতে হয়।

বলতে বলতে সিতেশ বাবু করুণ একটু হেসে বললেন,—আপনারা তো আজই চলে যাবেন মিস চৌধুরী,—একে একে এই হোটেলের সমস্ত লোকই চলে যাবে,—ফের নতুন লোকে এসে ঘব ভববে। কিন্তু আমাব ছুটি নেই। এই নিত্য নতুন আনাগোনার মধ্যে আমাকে রোজ বিকেলে যথারীতি পশ্চিমের বাবান্দায় দাঁড়িয়ে হুকুম মাফিক ওই কালো কুরূপা মেয়েটিকে প্রেম নিবেদন কবে যেতে হবে। আর মেয়েটিও পাশে দাঁড়িয়ে সেই পুবনো পচা প্রণয়-বিদূষণ কলের পুতুলের মত নির্বিকার হয়ে শুনবে। এব আর শেষ হবে না।

আজ আর ঘৃণা হয়নি সিতেশ বাবুকে। চকচকে পোষাক, নিখুঁৎ টাই-কলারেব নীচে ভদ্রলোককে প্রহসনেব নায়কের মত করুণ মনে হয়েছিল। নাছোড টি. বি. রোগেব হাত থেকে আমিও হয়ত একদিন নিষ্কৃতি পেতে পারি, কিন্তু প্রণয়ের অপরূপ নাগ-পাশে বদ্ধ এই লোকটির মুক্তি নেই।

মিলনান্ত

[এই গল্পের নাম মিলনান্ত, ঘটনাপ্রবাহও তাই। কাহিনীর শেষে হঠাৎ-স্টিয়ারিং-ঘোরান সারপ্রাইজ নেই। সহসা ব্রেক-কষা সাসপেন্সও না। লোকহিতায় এ-গল্প লিখিনি, যাঁরা এর মধ্যে জটিল মনস্তত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব খুঁজবেন তাঁরা হতাশ হবেন।

কোথায় শুরু করব বুঝতে পারছিলুম না। শেষ পর্যন্ত মনে হল সূত্রপাতটা মাঝামাঝি কোথাও হলেই ভাল হয়, সেই যেদিন নায়ক টেড দিল্লীতে গাড়ি বদলে সিমলা যাত্রা করেছিল। পিছনে যা রইল সেটা পরে আভাসে বলা আছে। সুতরাং সবেজমিনে কথারম্ভ করে দিই, বেতারের পরিভাষায় Over to Delhi]

এই মুখটি টেড খুঁজতে শুরু করেছিল দিল্লী জংশন থেকেই। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিল, মীটারটাও দেখল না, আনা আষ্টেক বোধ হয় বেশিই তুলল, সেলাম পেল কি পেল না নজর করল না, কুলীগুলো মালের ওপর ছোঁ দিয়ে পড়েছিল, তাদের হাত এড়াতে প্রথম যাকে দেখল তার হাতেই জিনিসপত্র সঁপে দিল, ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে গাড়ির নম্বর বলে জিজ্ঞাসা করল কোন্ প্ল্যাটফরমে। তারপর এদিক-ওদিক তাকাল। না, সেই পরিচিত মুখখানা নেই। স্টেলা আসেনি।

'চলিয়ে সাব', বলেই কুলীটা ছুটতে শুরু করেছিল, ভাঙা-পা আর কাঠের ক্রাচ নিয়ে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চলে না, হাজার লোকের ঠেলাঠেলি। ইনকোয়ারি অফিসের দিক থেকে একটি মেয়ে খুট-খুট করে এগিয়ে এল, তার মুখে মৃদু লিপস্টিক হাসি, টেড মুহূর্তমাত্র থমকে দাঁড়াল। না, সে-মুখ তো নয়। মেয়েটি গেটকীপারের দিকে চেয়ে ভ্রূভঙ্গী করল, তারপর হেসে কি বলে অন্যদিকে চলে গেল।

কুলীটা ততক্ষণ ওভারব্রীজের মাঝামাঝি। অকারণেই টেড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, প্ল্যাটফরমের পূর্ণচন্দ্র ঘড়িটার হিসাবে সময় এখনও প্রায় বিশ মিনিট. ক্রুদ্ধ হল নিজের ওপর, কেন ছুটতে পারছে না, স্টেলার ওপর, কেন আসেনি, কুলীটার ওপর, কেন এগিয়ে গেল এতটা। শেষ রাগটা একটা স্বগত শপথে রূপ নিল, 'ব্লাডি, উল্লু।' যথেষ্ট জোরাল হল না, রাগ পড়ল না, টেড ফের মনে মনে বলল, 'Sonofa—' শেষ করবার আগেই ওভারব্রীজের সিঁড়িতে হোঁচট খেল।

গাড়িতে উঠতে যাবে, রেল-কর্মচারী একজন টিকিট দেখে বলল, 'এটা নয় পরেরটা।' টেড খেঁকিয়ে উঠতে গেল, 'like hell you know,' শেষ পর্যন্ত কিছু বলল না কেন না, এ-লোকটা অন্তত পোশাকে তার স্বজাতি, সুড়সুড় করে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসল। স্টেলা আসেনি।

এখনও দশ মিনিট। কামরাটা খালি, টেড কপালের ঘাম মুছল, মুখ-ফেরান পাখাটাকে ঘুরিয়ে নিল, পাইপ বার করে পৌচ থেকে মিকশ্চার ভরতে লাগল টিপে টিপে।

টফি-বিস্কুট-চা-রুটি নিয়ে একটা পেডলার প্ল্যাটফরমের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত গড়-গড় করে চলে গেল, তার পিছন পিছন তকমা-আঁটা একটা

লোক, 'সাব, খানা ?' টেড জবাবে বলল, 'ভাগো।' সব শেষে এল কাগজ আর বইওয়ালা, টেড কিনলে দু'খানা থ্রিলর আর হাল-হপ্তার সচিত্র একটা ম্যাগাজিন, প্রচ্ছদে স্বল্প-স্বচ্ছবাস কয়েকটি নর্তকীর ছবি। টেড সুডৌল শুভ্র সুঠাম কয়েকটি পায়ের দিকে এক পলক চেয়ে রইল, তারপর ছুঁড়ে ফেলল কাগজটা। পৃথিবীতে এমন অপর্যাপ্ত, অপরূপ চলৎশক্তি, শুধু টেড স্থির, স্থাণু, দম-বন্ধ ঘড়ির কাঁটার মত।

সবুজ আলো জ্বলেছে, সবুজ নিশান উড়েছে, টেড শেষবারের মত জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল, না, সেই মুখখানি নেই, স্টেলা এল না।

সোনেপত, পানিপথ, কারনাল। কয়লার গুঁড়োয় জামা-কাপড় কালি, একটার পর একটা হল্ট, টেড জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে আছে। আম্বালাতে টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হল, পাইপটা বারবার নিবে যাচ্ছে, টেড বলতে যাচ্ছিল 'ড্যাম', সামলে নিল; বোধ হয় মনে পড়ল, এটা তো নেটিব নয়, পাইপ, খাঁটি ব্রায়ার।

আবার সবুজ আলো দিয়েছে, গাড়ির চাকায় চাকায় টান। প্ল্যাটফরমের শেষপ্রান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে একটি মেয়ে, টেড উৎসুক মুখ বাড়িয়েছিল, কিন্তু এ-মেয়ে সে নয়। মেয়েটি ওর কামরার সমুখেই দাঁড়িয়ে পড়ল, দরজার হাতলে ব্যর্থ একটা মোচড় দিয়ে বলল, 'প্লীজ—প্লীজ লেট মি ইন।'

ততক্ষণে হুইসল দিয়েছে, টেড বিনা-বাক্যব্যয়ে দরজা খুলে দিল। আড়-চোখে চেয়ে দেখল, মেয়েটির সর্বাঙ্গ সিক্ত, হাতে ছোট্ট একটা ব্যাগ, নখে, গালে, ঠোঁটে ছোপ-ছোপ লাল। ওর সামনের সীটে বসেই মেয়েটি হেঁট হয়ে মোজা খুলতে লাগল, টেড আবার মুখ বাড়িয়ে দিল জানালার বাইরে।

রাত শেষ হয়ে এসেছে, তারাগুলো ছুটছে যেন রীলে করে, একজন পিছিয়ে পড়ে তো আরেকজন সঙ্গ নেয়, দুর্বোধ্য স্বরলিপির মত টেলিগ্রাফের তার আছে পাশে পাশে। এতক্ষণে টেড যেন টের পেল বর্ষার হঠাৎ জোর বেড়েছে, বড় বড় ফোঁটায় ওর মুখ ভেসে গেল। জানালা নামিয়ে দিয়ে ফিরে বসবে সে সাহস হল না, টেড নির্ভুল জানে মেয়েটি নিশ্চয় একজোড়া কালো কৌতূহলী চোখ ওর পিঠের ওপর রেখেছে। সামনে বৃষ্টির কাঁটা, পিছনে দৃষ্টির ছুরি, মাঝখানে ভোজ্য মাংসখণ্ডের মত টেড অস্বস্তির পিণ্ড হয়ে বসে রইল।

খস খস শব্দ হল, মেয়েটি মেজে থেকে ম্যাগাজিনটা বুঝি কুড়িয়ে নিয়েছে। মুখ ফেরাতেই টেড লজ্জিত-অপ্রতিভ এক টুকরো হাসি দেখতে পেল, মেয়েটি বলল, 'মে আই—'

টেড আবার মুখ ফিরিয়ে নিল।

ভরসার কথা, রাত কেটে যাচ্ছে, চণ্ডীগড় ছাড়িযে গেল, এবারে চড়াই, আর একটু পবেই দেখা দেবে শিবালিক বেঞ্জ, কালকা। সেখানে স্টেলা নিশ্চয় আছে।

টেড টের পেল মেয়েটি ঝুপ করে কাগজটা ফেলে দিয়েছে, ফশ করে দেশলাই জেলে ওঠার শব্দও শুনল, বোধ হয় সিগারেট ধরিয়েছে। টেড ফের পাইপটা ধরাতে গেল, দেশলাই খুঁজে পেল না।

একটা পীত-রক্তাভ হাত ওর দিকে এগিয়ে এসেছে, প্রজ্জ্বলন্ত একটা কাঠি, 'হিয়ার ইউ আর।' টেড কৃতজ্ঞ, তবু বিরক্ত, বিড় বিড় করে বলল, 'থ্যাঙ্কস্—থ্যাঙ্কস্ এ লট।'

সীটের পাশে-রাখা ক্রাচটার দিকে মেয়েটির বোধ হয় এতক্ষণে নজর পড়েছে, মিষ্টি, রিনরিনে গলায় বলল, 'বীন টু ওঅর ?'

টেড ঘাড় নাড়লে।

—দেন্ এ্যাকসিডেণ্ট ?

—নো।

মেয়েটি এবার মুষড়ে পড়ল, কতকটা কৈফিয়তের স্বরে বলল, 'ওয়েল, আই সও দ্য ক্রাচ—'

টেড গম্ভীর গলায় বলল, 'নেভার মাইণ্ড দ্য ক্রাচ।'

এর পরে আর আলাপ চলে না।

মেয়েটির আক্রমণ এবার কোন্ দিক থেকে আসবে টেড ভাবতে লাগল। জলের ধারায় আসন ভিজে যাচ্ছে, মেয়েটি হয়ত বলবে, 'ইউ উইল প্লীজ পুল দ্য শাটার ডাউন, ওণ্ট ইউ?'

টেড বলবে, 'আই ডোণ্ট থিঙ্ক আই উইল।' অভদ্রতা হবে, ম্যানার্স-বাইবেল অশুদ্ধ হবে, কিন্তু কেন স্টেলা এল না, কেন, কেন।

গাড়ির গতি কমেছে, গ্লোরি টু মেরি, আর ভয় নেই, কালকা এসে গেছে। টেড জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। মেয়েটি কখন খুট করে দরজা খুলে নেমে গেছে।

কালকাতেও সেই মুখ দেখা যায়নি, দেখা গেল একেবারে সিমলায় পৌছে, কার্ট রোডে গাড়ি দাঁড়াতে।

স্টেলা ছুটে এল, জড়িয়েও ধরল দু'হাতে, তবু সেই স্পর্শে নিবিড় উত্তাপ সঞ্চারিত হ'ল না তো, সেকি শুধু টেড দস্তানা পরে আছে সেই জন্যে।

—'টেডী ডিয়ার, ইউ মাস্ট নো বব্, রবার্ট ড্রেক। ডাক্তার, আমাদের বন্ধু।'

স্টেলার পাশেই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, গায়ে পুরু ওভারকোট, মাথায় অন্তত সওয়া ছ'ফুট, টুপিতে হাত দিয়েছিলেন, টেড হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হাউ ডু ই ডু, মিঃ ড্রেক।'

প্রত্যুত্তরে ড্রেকও ওই কথাটাই বললেন।

বরফের শাদা চাদর পড়েছিল রাস্তায়, স্টেলার কনুইয়ে ভর দিয়ে টেড এগোতে গেল, স্টেলা বলে উঠল, 'ওয়াচ ইয়োর স্টেপস্, ডিয়ার। দেখে দেখে পা ফেল।'

টেড তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, 'ইউ থিঙ্ক আই হ্যাভ টু?'

স্টেলা বরফে হীল ঘষতে ঘষতে বলল, 'ইয়েস', আর পিছন থেকে কে যেন গলা কেশে বলল, 'ইউ নো মিঃ সাটন, দেয়ার্স্ এ স্লিপারি স্লোপ এহেড্—'

টেড পিছনে চেয়ে দেখল কালো ওভারকোট আর টুপিতে প্রচ্ছন্ন একটা মূর্তি, ডাঃ ড্রেক। একটু হাসল টেড, পাইপটা ঠোঁটে রেখেই জড়িত স্বরে বলল, 'আই থট্ এ্যাজ্ মাচ্। আমি জানতাম।'

ঠিক তখুনি শিষ দিয়ে উঠলেন ড্রেক, জন চারেক লোক একটা রিক্সা নিয়ে ছুটে এল, চোখের ইশারায় ড্রেক টেডকে বললে উঠে বসতে। টেড একবার ভাবল উঠবে না, স্টেলার হাত ছেড়ে দিয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়াতে গেল, পারল না, ক্রাচটা পিছলে গেছে, টলে পড়ল।

ড্রেক তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেললেন। আর প্রতিবাদ করার সাহস

হল না, টেড সুবোধ শিশুর মত রিক্সায় উঠে বসল, ওর পিছনে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল স্টেলা আর ড্রেক।

ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় বুকের ভিতরটাও যেন হিমে জমে গেছে, টেডের অনেককাল পুরনো একটা ছবি মনে পড়ল। ওর বাবাকে তুলে দিয়েছে কালো ঘোড়ায় টানা গাড়িতে, পিছনে ওর হাত ধরে চোখ মুছতে মুছতে চলেছেন টেডের মা। ফুলের মালায় কফিন পুরোপুরি ঢেকে গেছে। Say it with flowers. যেদিন সবাই মিলে টেডকে তুলে দেবে কালো ঘোড়ার গাড়িতে, সেদিনও কি স্টেলা এমনি পিছে-পিছে আসবে, ওর পাশে থাকবে ওই দৈত্যাকার ওভারকোটটা—বব ড্রেক? Say it with flowers. ফুলে কি এত কাঁটা।

ড্রেক বাড়ির ভিতরে এল না, সিঁড়িব কাছ থেকেই বিদায় নিল। ওবা নিঃসঙ্গ হতেই স্টেলা আবাব দু'হাত জড়িয়ে দিল ওর গলায়। উচ্ছ্বসিত স্ববে বলল, 'I'm glad, dear, you've hurried home to me.'

এখন দস্তানা নেই, কী ঠাণ্ডা, শাদা স্টেলাব আঙুল, টেডের গলার শিরাগুলো পর্যন্ত নীল হয়ে উঠেছে। ঠোঁটে দাঁত চেপে টেড ধীরে ধীরে বলল, 'You rather would I stayed away? দূরে থাকলেই কি খুশি হতে?'

স্টেলাব মুখে বক্ত ছড়িয়ে গেল, কোন মতে বলল, 'হোয়াটেভার ইজ দি ম্যাটার উইথ ইউ। কি হয়েছে তোমার বল ত।'

টেড এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল; এই ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখখানাই কি সে দিল্লী থেকে সারা পথ খুঁজতে খুঁজতে এসেছে।

আস্তে আস্তে বরফ বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে বলল, 'ইউ আর কোল্ড্, ডিয়ার।'

জবাবের প্রতীক্ষা করল না, ঘরের কোণে একটা লোহার শিক পড়ে ছিল, সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে আগুনটা খুঁচিয়ে দিতে লাগল। নিবে যেন না যায়, হে ঈশ্বর, অন্তত একটু উত্তাপ যেন অবশিষ্ট থাকে।

বিকেলে ওরা সকলে এল একে একে। টেড দাড়ি কামিয়ে পোশাক বদলে এখন দস্তুরমত স্টেলার স্বামী এড্ওয়ার্ড সাটন—সকলকে স্মিত হেসে অভিবাদন করল। সামার হিল থেকে এসেছেন জোসেফ ক্লিফটন একদা পুলিশে বড় চাকরি করেছেন; তারা দেবী থেকে জিমি ওয়ালেস, রেলের চাকুরে; প্রসপেক্ট পাহাড় থেকে জর্জ রে; জ্যাকো থেকে ফ্রেডাবিক, আর মাসোব্রা থেকে ডাঃ ড্রেক। এই তো ক' মাস মোটে হাসপাতালে চাকরি নিয়ে এখানে এসেছে, এবই মধ্যে এত বন্ধু স্টেলাব?

পাথরে পাথরে ঘা খাওয়া ঝর্ণাব মত, সদ্য খোলা সোডাব বোতলের মত ফেনায়িত হয়ে উঠছে স্টেলা, স্বচ্ছ চপল, লীলায়িত। ও ডিয়ার, রীয়েলি, আর ক্রাইস্টের বুদ্বুদে ছেয়ে গেছে হাওয়া। এত কথা জানে স্টেলা!

হাসতে হাসতে স্টেলা গ্রামোফোনে কখন চড়িয়ে দিল নাচের একটা গৎ,

"Sweetheart, if you stay
A million miles away"

ডিস্ক পুরোপুরি না ঘুরতেই সেটা থামিয়ে দিল, বলল, 'অফুস।'

জিমি বলল, 'চলুক না,' উঠে গিয়ে দাঁড়াল স্টেলার পাশে, সাউণ্ড বক্সের ওপর ঝুঁকে পড়ে সামান্য একটু হাতাহাতি, স্টেলার হাতে পিন ফুটে গেল, এক ফোঁটা রক্ত, বলল, 'উঃ।'

ঘরের এক কোণে বসে আছে টেড, দেখছে। চোখ তুটো ওষ্ঠ-লগ্ন পাইপটার চেয়েও প্রজ্জ্বলন্ত, বাইরে চেয়ে দেখল, শাদা শাদা পালকে আকাশ ঢেকে গেছে, হিম-মৃত্যু। বেশ হয় যদি দরজা জানালা সব ঢেকে যায় বরফে, কঠিন স্তরের পর স্তর, নীরন্ধ্র একটা তুহিন কবরে বরাবরের মত থেমে যায় একটি প্রগলভ নারী-কণ্ঠের কাকলি, পরপুরুষের সঙ্গে কপট কলহ।

একদা পুলিশের বড় চাকুরে ক্লিফটন তখনও ওর পাশে বসে। চিনির একটা ডেলা চায়ে মেশাতে মেশাতে বললেন, 'রিমাইণ্ডস মী অব এ্যান আফটারনুন ইন কেনসিংটন। কেনসিংটনের সেই বিকেলটি মনে পড়ছে।'

টেড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, সব মিথ্যে, সে জানে ক্লিফটন কখনও কেনসিংটনে যায়নি, এরা কখনও যায় না, কিন্তু সুযোগ পেলেই বড়াই করে।

সাড়া না পেয়ে ক্লিফটন আবার বললেন, 'এভর বীন হোম?'

হোম? টেড এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'নো—নট ইয়েট।'

ক্লিফটন নীরব দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'পিটি।'

হঠাৎ ওর পাশে এসে টপ করে বসল জর্জ। বলল, 'আজ আর ক্লাবে যাওয়া হল না, দেখছি। হেল, দিস ব্লাইণ্ডিং স্নো। ডু উই প্লে ব্রিজ?'

টেড ঘাড়টা ঈষৎ সঙ্কুচিত প্রসারিত করে উত্তর দিল, যার অর্থ শালগ্রামের আবার শোয়া আর বসা। ঘরের অপর প্রান্ত থেকে হাত তালি দিয়ে উঠল স্টেলা।

'কাট ফর পার্টনার?' জিমি তাস গোছাতে গোছাতে বলল।

'পার্টনার?' টেড চমকে উঠল, মুহূর্তমাত্র, বলল, 'অলরাইট।'

স্টেলা গেল বব ড্রেকের দিকে, জিমি আর টেড একদল হল। ড্রেক বলল, 'স্টেক্‌স?'

টেড পকেটে হাত ঢুকিয়ে যত পেল সব টেবিলের ওপর উপুড় করল। বলল, 'এভরি ডো।'

স্টেলা আড়চোখে টেডের দিকে তাকাল, ঘন ভ্রূর নীচে তখনও দু'টো মণি ঠক ঠক জ্বলছে, বেশিক্ষণ তাকাতে পারল না, চোখ ফিরিয়ে নিল।

তারপর টেড একটানা জিতে গেল। প্রতিটি রবারের শেষে হিংস্র আগ্রহে টেবিল থেকে পয়সা কুড়িয়ে কুড়িয়ে পুরল পকেটে, খসখসে নোটের তাড়ায় বুক পকেট উঁচু হয়ে উঠল।

দশম রবারের শেষে, দু'হাত মাথার ওপর তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ড্রেক বলে উঠল, 'লেট'স কল ইট এ ডে।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে টেড উঠল টেবিল ছেড়ে, ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে গেল, সেলার থেকে একটা বোতল বার করে মুখের ওপর উপুড় করল। কী জ্বালা, কী শাস্তি।

বরফ পড়া বন্ধ হয়েছিল। সবাইকে এগিয়ে দিয়ে এসে দরজা ভেজিয়ে দিল স্টেলা, কবাটে পিঠ রেখে টেডের চোখে চোখ রেখে অস্ফুট গলায় বলল, 'বীস্ট।'

হাতের বোতলটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে টেড হেসে বলল, 'ইয়েস, ডিয়ার। বাট আই কুড্‌ন্ট হেল্প উইনিং, কুড আই?'

তাবপর যত নোট, খুচরো পয়সা ছিল, সব টেবিলেব ওপর ঢেলে দিয়ে বলল, 'টেক ইট্।'

সেই ধক ধক দৃষ্টি নিবে গেছে, ক্রাচে ভর দেওয়া, হৃতস্বাস্থ্য একটা ত্রিভঙ্গ দেহ, ক্রুশবিদ্ধ যীশুব ছবিব মত।

হঠাৎ থেমে গেছে ববফেব ঝড়, পুরু শ্লেটেব শাদা আস্তবেব নিচে কঠিন পাথব বেরিয়ে পড়েছে, কার্ট বোডে কুলু ভ্যালী সঞ্জাউলিব বাসের ভীড, প্রসপেক্টে পিকনিক; ম্যালে সেই দু'মুখী জনস্রোত, স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্টে পরিচিত জটলা। কুয়াসা আব মেঘ যেন এক ফুঁয়ে মুছে গেছে, নীল-নির্মল দিগন্তে জ্যোতির্লেখাব মত হিমালয়েব তুষার কিবীট।

রিজের বেঞ্চে বসে বসে টেডেব কোমব ধবে যায়, এই পথ এঁকে বেঁকে হাসপাতাল হয়ে গেছে মাসোব্রাব দিকে। স্টেলা এখনও এল না?

অসহিষ্ণু হয়ে টেড পাইপটা তুলে নিল, হাওয়ায় কাঠিগুলো বাববাব নিবে যাচ্ছে, টাইটা উড়ে এসে নাকে পড়ল,—হেল। দুটি পাহাডী মেয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল, টেডেব দিক চাইল একবাব, টেড তো নয়, তাব ক্রাচটার দিকে, কী বলাবলি কবল নিজেদেব মধ্যে, তাবপব হাসতে হাসতে ঢালু পথে নেমে গেল। পথেব উপবেই ক'জন কিউবিও সওদা বিছিয়ে বসেছে, পিতলেব ওই বড মূর্তিটা কী, বোধ হয় বুদ্ধ। আবও টুকিটাকি কিছু জিনিস, ব্যাঙ্গলস এ্যাণ্ড ব্রেসলেটস, সেগুলো নিয়েই উৎসুক ক'টি হাত কাডাকাডি কবছে।

টেড আব একটা শপথ উচ্চাবণ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দূবে দেখা গেল স্টেলাকে, থেমে গেল।

'এত দেরী হল?'

'কী করি, কাজ ছিল।'

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তর, টেড ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, স্টেলা এগিয়ে এসে ওর কনুইয়ে হাত গলিয়ে দিল, 'বাড়ি চল।'

'চল।'

ঢালু অনেকখানি পথের পর আবার চড়াই, স্টেলা বলল, 'রিক্সা নিই?'

কথাটা বলল টেডকে, কিন্তু সন্দেহ নেই স্টেলা চেয়ে আছে ক্রাচটার দিকে, ঈষৎ করুণা, অনুকম্পা, অবহেলা। হা-ঈশ্বর, একটা মানুষের চেয়ে তার ক্রাচটাই বড় হল?

মুহূর্তে টেডের শরীরের পেশী কঠিন হয়ে উঠল। 'আই'ম অল রাইট। গ্যেস, আই'ল ওয়াক।'

বাড়ি ফিরেই স্টেলা স্টোভের প্লাগ এঁটে দিয়েছিল, চা তৈরি হতে মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগল না। রুটির টুকরো ছিঁড়তে ছিঁড়তে টেড বলল, 'এবার কী করব।'

তাই তো, কী। বাইরে মেঘ মুছে যাওয়া প্রসন্ন বিকেল, তিনশো ফুট নীচে রেল স্টেশনে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে দিনের শেষ গাড়িটা এসে দাঁড়াল, জ্যাকো পাহাড়ের ঝকঝকে টালির বাঙলোগুলো স্পষ্ট দেখা যায়, নীচের গভীর খাদ থেকে উঠে এসে ফারগাছের ডালগুলো সার্শির ওপর সরসর হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। টিক টিক দেয়ালের ঘড়িতে, টিপ টিপ টেডের কপালের রগে, কিছু কাজ-না-থাকা ভারী সীসে সন্ধ্যাটা যেন সাঁড়াশির মত কঠিন আঙুল নিয়ে ওর কণ্ঠনালী লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

ঘরের কোণে রাখা বাজনাটার দিকে তর্জনী দেখিয়ে টেড বলল, 'ওন্ট ইউ প্লে মি সামথিং।'

স্টেলা উলের কাঁটা নিয়ে বসেছিল, পোষা কুকুর প্রিন্স সেই ম্যাগাজিনের মেয়েদের পা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, টেড হঠাৎ বলে উঠল, 'কিছু বাজাও না।'

'কী শুনবে।'

'জাস্ট এনিথিং।'

যা হোক কিছু। শুধু একটু সঙ্গীত চায় টেড, রিনরিন টুংটুং মিষ্টি সুরে এই ঘরটুকু ভরে উঠুক, ঢেকে দিক ওদের দুজনকে, নরম বরফের প্রচ্ছদ যেমন কঠিন পাথর ঢেকে দেয়।

বিয়ের পরের প্রথম দিককার অপরাহ্ণগুলি একটির পর একটি ভীড় করে এসেছে আজ, মাঠ থেকে ফিরে এসে ওরা যখন পাশাপাশি বসেছে, আট ফার্লং দৌড়ের বাজি জিতে তখনও টেডের রক্ত তপ্ত, নাড়ি দ্রুত।

স্টেলা বলত, 'টেড, তোমার নেশা হয়েছে।'

নেশা বইকি। টেডের কানে বাজছে গ্যালারি থেকে ঝড়ের মত হাত-তালি, জোরে আরও জোরে, শুয়ে পড় ঘোড়ার পিঠে, বিদ্যুতের আগে ছুটুক মাই হার্ট, তার ক্ষুরে আগুনের ফুলকি, দৃষ্টি গতি-অন্ধ, নাকে-মুখে ফেণা।

'কী ভাবছ, মাই হার্ট কেমন দৌড়েছিল?' স্টেলা কখন গলায় জড়িয়ে দিয়েছে দুখানা নবনীত হাত, তখন স্টেলা দস্তানা পরত না, হাতে রক্ত মাংস ছিল, টেড ঘ্রাণ নিয়েছে সেই কবোষ্ণ করপল্লবের, আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চেতনা, তারপর বুকভরা সেই তৃপ্তি, অতৃপ্তি, পাওয়া, আরও চাওয়া, স্ফীত নাসারন্ধ্রে তপ্ত নিঃশ্বাসের রূপ নিয়েছে।

'তোমার মাই হার্টকে আজ মাঠে দেখলুম। কী জোরে দৌড়য়, বাপরে, আমার ভয় করে। আই হেট দ্যাট এনিমল্।'

'শী'জ গ্লোরিয়স। হ্যাজ নেভার লেট মি ডাউন' কখনো মাই হার্ট টেডের মুখ হাসায়নি, স্পার্টে না, গ্যালপে না, বাজিতে না। মাইনর প্লেট থেকে মেজর কাপ—একটানা উইন।

সেই মাই হার্টই শেষ পর্য্যন্ত ডোবালে ওকে। কলকাতার কোর্সে হঠাৎ বেণ্ডের মুখে কাৎ হয়ে পড়ল, বিউটি কুইন ছিল ছ'লেংথ পেছনে, সে কোথা থেকে এসে পড়ল ঘাড়ে, আর কিছু মনে নেই। গ্যালারিতে সোরগোল, একটু পরে সব অন্ধকার।

মাই হার্টও বাঁচেনি। ওকে ওরা গুলী করে মেরেছিল। সেই মাঠেই।

ছ' মাস পরে হাসপাতাল থেকে ক্রাচে ভর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে টেড, চ্যাম্পিয়ন জকি ওল' টেডী নয়, নিনখদাঁত জেণ্ট্‌লম্যান, মিঃ এডওয়ার্ড সাটন। পিছনে পড়ে রইল মুহুর্মুহু করতালি-মুখরিত গ্যালারি, বিদ্যুৎগতি ঘোড়ার পিঠে কয়েকটি স্বেদাপ্লুত মুহূর্ত, হ্যাণ্ডিক্যাপ, স্টেকস, টোট, ট্রট আর গ্যালপের পৃথিবী। পকেটে সামান্য কিছু টাকা, ক্ষতিপূরণের আর ইনসিওরেন্সের, তারও কিছু চেয়ে নিয়েছে ওর সেরা দোস্ত ট্রেনার আবদুল আলি।

পিয়ানোয় বেজে উঠল একটা গৎ, টেড শিস দিলে, মেজেয় তাল ঠুকলে জুতোর গোড়ালি দিয়ে, সহর্ষ একটা অব্যয় উচ্চারণ করলে। স্টেলা বাজিয়ে চলেছে 'Is it true your love is burning low ?'

ঠিক তখুনি বাইরের দরজায় কে বোতাম টিপলে, প্রিন্স লেজ নাড়া মুলতুবী রেখে এদিক ওদিক কী শুঁকল, তারপর লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল বাইরের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে বাজনাটা আর্তনাদ করে থেমে গেল।

'কে' ডালাটা বন্ধ করে স্টেলা জিজ্ঞাসা করল অস্ফুট স্বরে। টেড উঠে গেল।

টুপি ছুঁয়ে ড্রেক অভিবাদন করল ওকে। ছ'ফুট লম্বা ওভারকোটে ঢাকা দৈত্য, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দরজা জুড়ে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'আসতে পারি ?'

পিয়ানো ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্টেলা বলে উঠল, 'মাই! ইট'স্ বব্।'

অনুমতির অপেক্ষা করল না, কার্পেটের ওপর ওর ঢাউস-নৌকো জুতোর ছাপ এঁকে দিতে দিতে ববার্ট ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

প্রিন্স লেজ নাড়তে নাড়তে ফিরে গেল আগুনের পাশে, হার্থ-রাগের ওপর কুণ্ডলীকৃত হয়ে বসল। কুঁকড়ে গেছে টেডের ভিতরটাও, সেও ফিরে এল অগ্নিকুণ্ডেব পাশে, প্রিন্সে'র গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। একজনের জিভ লকলক কবছে আবেকজনের ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, একটা কুকুর আর একটা মানুযের মনের মধ্যে সেই মুহূর্তে একটা সাঁকো তৈরি হয়ে গেল।

পরদিন আবার ববফপড়া শুরু হল। সকাল থেকে আকাশ থেকে যুঁই-ফুল ঝরছে তো ঝবছেই, শোঁ-শোঁ হাওযাব ক্রুদ্ধ মুষ্টি শার্সির কাচে, ছাইরঙ আকাশে অগুনতি সাপের কিলবিলি।

স্টেলা ছুটি নিয়েছে হাসপাতাল থেকে, কিন্তু আনাগুলের স্কেটিং লিঙ্ক-এ যেতে ভোলেনি। সেখান থেকে ক্লাব।

ক্লাব ঘরে নিরিবিলি কোণে গ্লাস সমুখে নিয়ে টেড। কিছু ভাল লাগে না তাব এসব, সব ছেড়ে-ছুঁড়ে ছুটে পালাতে পারলে ভাল হত,

কিন্তু কোথায় যেন শিকল আঁটা আছে, বসে বসে চুমুক দেয়, আড়চোখে দেখে।

কাটা কাটা কথা কানে আসে।

—Know who the man is?

—O, it's that bloke invalided home, husband of that Sutton woman.

ইনভ্যালিডেড হোম। ব্যস আর কেউ নয়, কিছু নয। এ মীয়র নোবডি। টেড ফের গ্লাসে চুমুক দিল।

ঘবের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে, আলকোভে মিষ্টি একটা স্থব বেজে উঠল, এবার নাচ শুরু হবে। প্রায়ান্ধকাব ঘবে খিলখিল হাসি, কাব গলা। স্টেলাব।

স্টেলাও নাচবে। ওব কোমব বেষ্টন কবে একটা লোক দাঁডিয়েছে, ওকি বব্ ড্রেক, ওকি জিমি। টেড কিছু দেখতে পাচ্ছে না, নিষ্প্রভদীপ ঘর, ঘোলাটে চোখ, সব একাকাব, ফ্লোবেব দুপ্‌দাপ আব বাইবেব শোঁ শোঁ ঝড, সব। ঢেউয়ের পর ঢেউযে সাগব তোলপাড, টেড নামেনি, অশক্ত অক্ষম দেহ নিযে তীবে বসে বালুসৈকতে নখের আঁচড় কাটছে।

অনেক পরে সম্বিৎ ফিরে এল, কানেব কাছে প্রমত্ত দুটি কথায়, 'মিঃ সাটন, তুমি নাচবে না?'

ড্রেক কখন এসে ওর পাশে বসেছে, আবক্ত আবিল দৃষ্টি, শ্রমস্বেদাক্ত কপাল রুমালে মুছতে মুছতে লঘু চপল গলায় বলছে, 'সাটন, তুমি নাচবে না?'

এত অপমান টেডকে কেউ করেনি। কপালেব শিবা স্ফীত হয়ে উঠেছে,

টেডের বাঁহাতের গ্লাস কাঁপছে থরথব করে, ডানহাতে সে ক্রাচটাকে শক্ত করে চেপে ধরল।

কানের কাছে মুখ নামিয়ে ড্রেক ফিসফিস করে বলল, 'আই'ম আউট। ইয়োর ওয়াইফ স্টিল সীমস ফিট ফর এ গুড ফীউ ডান্সেস, হোয়াই নট পার্টনার হার হোয়েন দি গোয়িং ইজ গুড?'

অনেক কাচের পাত্র যেন একসঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল এমনি হাসির তোড উঠল ঘরে। স্টেলাও হাসছে।

ক্রাচটাকে কঠিন মুঠিতে চেপে ধবে টেড উঠে দাঁড়াল। বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠল, 'ইয়েস, হোয়াই নট।' ক্রাচটা তুলে সবটুকু শক্তি প্রয়োগ কবে আঘাত করলে ড্রেককে। টলতে টলতে বসে পড়ল নিচে।

নিমেষে থেমে গেল এ্যালকোভের আবহসঙ্গীত, কক্ষেব সব ক'টি আলো প্রখর হযে উঠল। ক'জন লোক ধরাধবি কবে ড্রেককে নিয়ে গেল বাইরেব ঘবে, স্টেলা কোমবে হাত দিযে টেডের সমুখে দাঁডাল।

'বীস্ট, বীস্ট, বীস্ট।'

টেডের গালে ওব রক্তচাপা আঙুলের দাগ গভীব হয়ে বসে যাচ্ছে, আব হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে 'বীস্ট।' টেড অবাক হয়ে বসেই রইল, আত্মরক্ষার জন্যে হাত তুলল না পর্যন্ত, সম্মোহিত, মুগ্ধ, প্রলুব্ধ চোখে একটি কুপিত আঁখিব ফুলকি আব উদ্ধত বুকেব স্পন্দনের দিকে চেযে রইল।

স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্টে কাণাঘুষা শোনা গেল, স্টেলা, দ্যাট সাটন ওম্যান, আর তার স্বামী এডওয়ার্ডের ছাড়াছাড়ি হবে।

প্রাক্তন পুলিশ অফিসার ক্লিফটন মধ্যস্থতা করেছেন।

'সাটন, সীমস্ ইয়োর ম্যারেজ ডিড্'ণ্ট ওয়ার্ক। তোমাদেব এ-বিয়ে সুখের হয়নি।'

আবক্তনেত্র টেড মুষ্টি তুলে বলেছে, 'সো হোয়াট।'

'হোয়াই নট পার্ট।'

সব তেজ নিমেষে উবে গেছে, বিবর্ণ মুখে টেড বলেছে, সে-যে বড কেলেঙ্কারি—

কাছে এসে ওর পিঠে হাত বেখে ক্লিফটন বলেছেন, 'কিন্তু এই একমাত্র পথ। ফর ইয়োর হ্যাপিনেস, ফব স্টেলা।'

'স্টেলা? স্টেলাও তবে এই চায়?'

ক্লিফটন শান্ত গলায় বলেছেন, 'চায়।' শ্রান্ত ভগ্ন কণ্ঠে টেড বলেছে, 'বেশ, আমি বাজি। কিন্তু টাকা?' কোটেব পকেট থেকে লাইনিং শুদ্ধ বের কবে ক্লিফটনকে দেখিয়েছে।

ক্লিফটন বলেছেন, '—খরচ স্টেলা দেবে।' টেডেব কানেব কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বলেছেন, 'সব ব্যবস্থা আমবা কবে দেব,—তোমাকে শুধু নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট হোটেলে যেতে হবে।'

টেড তবু চুপ কবে বসে আছে দেখে ক্লিফটন ওব একটা হাত টেনে নিয়ে বললেন, 'অমত কব না। ভেবে দেখ, এতে তোমাবই সুখ, তোমাবই শান্তি।'

'আমার সুখ, আমাব শান্তি।' নির্জীব স্বরে পুনবাবৃত্তি কবল টেড, একটু থেমে আবাব বলল, 'এই সুখ আর এই শান্তি পাব বলেই বুঝি

আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই এতখানি পথ ছুটে এসেছিলাম ক্লিফটন।'

তারপর সেই স্তম্ভিত গম্ভীর রাত্রি এল।

সন্ধ্যা থেকেই দিগন্ধ বৃষ্টি; বজ্রবুট পরে অশরীরী কারা যেন আকাশের এপার থেকে ওপার মার্চ করে গেছে, বিদ্যুতের তীব্র টর্চ ফেলে খুঁজে ফিরেছে ফেরারী আসামী। পথে কোথাও টিপটিপ করে জ্বলছে দু'একটা বাতি, কোথাও বা নিবে গেছে, জ্যাকো-প্রসপেক্ট-মাসোত্রা কালীদহে স্নান করে নিরাকার।

চারজন লোক রিক্সা করে টেডকে নিয়ে এল হোটেলের দরজায়, রিসেপ্-শন কাউণ্টারের লোকটা এগিয়ে এল। টেড নিজের নামটা বলতেই লোকটা ফিসফিস করে কী বলাবলি কবল আরেকটা লোকের সঙ্গে, কুলীকে হুকুম দিল ওকে ঘর দেখিয়ে দিতে।

ল্যাচ-কী হাতে কুলীটা আগে আগে আছে, ক্রাচ-নির্ভর টেড পিছে, সরু দীর্ঘ প্যাসেজ, গোলক ধাঁধা করিডরের পর করিডর, দু'পাশে নম্বরী খুপরির সারি। কোনটা ভেজান, কোনটা বন্ধ, কোনটাব ভেতরে বা চাপা-হাসির আভাস।

সেই স্বল্পালোক প্যাসেজেও কুলী নির্দিষ্ট নম্বর খুঁজে পেল ঠিক, ফোকরে চাবি গলিয়ে দিল, সেলাম করে বলল, 'ইয়ে কামরা হ্যায় সাব।'

বিয়ের দিন টেড পাদ্রী সাহেবের নির্দেশে একটির পর একটি আচার পালন করেছিল, সেদিনও বুক দুরু দুরু, ঘন ঘন চোখের পলক পড়েছে, কপালে

জমেছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। সেদিনেব মন্ত্রমুগ্ধ প্রশ্নহীন তিথিটাই কি আজ এতদিন পবে ফিরে এল যৌবন শেষেব এই বোমাঞ্চিত বাতে, তুহিন শৈল-শিখবের এই হোটেলটিতে।

টেড ভেতরে গিয়ে অপেক্ষা কবতে লাগল। এখনও সে আসেনি তো। চাব ধাবে চোখ বুলিয়ে টেড আশ্বস্ত হল। আসবাব বেশি নেই, টি-পয়, টেবিল আয়না, কৌচ, বিছানা, সংলগ্ন স্নানের ঘব।

জানালাটাব ছিটকিনি খুলে দিতেই তুটো পাল্লা সশব্দে ছিটকে ঠেকল দেযালে, ডানা ঝটপট কবে হাজাব বাজপাখি যেন ঘবেব দেয়ালে আছড়ে পডল। সভযে টেড পিছিযে গেল। ঘবেব মেজে ভেসে যাচ্ছে, যাক, টেড কিছুক্ষণ খোলা জানালায় মাথা বেখে দাঁড়াবে।

পিছনেব দবজায় খুট কবে শব্দ হল, টেড চমকে ফিবে তাকাল। ঘরেব মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে একটা মেয়ে, থবথব হাত তুটি পিছনে নিয়ে দবজাটা ভেজিযে দিচ্ছে।

'ইউ।' টেডের গলা দিয়ে অতিশয বিস্মিত একটি শব্দই বেবিয়ে এল।

'ইয়েস।' মেযেটি মাথা নীচু কবে বলল।

উত্তেজিত টেড কী করবে ঠিক পেল না, পাইপটা খুঁজল, পেল না, কোটের সবকটি বোতাম একবাব এঁটে দিয়ে ফেব খুলে দিল।

টক—টক', টক—টক,—ছোট্ট হাই হীল সময়েব পাযে, সেকেণ্ডের স্পাইরাল সিঁড়ি অনায়াসে টপকে যাচ্ছে। কপালেব বগে হাত দিয়ে কৌচে বসে আছে টেড, মেযেটি বিছানায় পা ঝুলিযে। অনেক পবে টেড হঠাৎ মাথা তুলে বলে উঠল, 'Say, haven't we met before?'

কুন্ঠিত ক্লিষ্ট হেসে মেয়েটি মৃদুস্বরে বলল, 'ইয়েস, ওয়ান্স। একবার দেখা হয়েছিল।'

কোথায়, কোথায়, কবে—টেড প্রায় চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। মনে পড়েছে। আম্বালায় যাকে দরজা খুলে কামরায় তুলে নিয়েছিল, এ তো সেই। সেও এক দুর্যোগের রাত্রি।

শন শন হাওয়ায় জানালার পাল্লা থর থর কেঁপে উঠল, মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ম্যান, আর ইউ ক্রেজী?' ভাল করে ছিটকিনি এঁটে দিল। একটা সুইচ টিপে দিতেই অগ্নিকুণ্ড গনগনে হয়ে উঠল।

সেখানে দুটি চেয়ার টেনে নিয়ে মেয়েটি বলল, 'কাম, ওয়ার্ম ইয়োর লেগস। পা দুটি গরম করে নাও।'

'লেগস?' মৃদু হেসে টেড বলল, 'আই'ভ্ বাট ওয়ান।'

মুহূর্তগুলি ফোঁটা ফোঁটা ঘাম হয়ে কপালে জমল, শুকিয়ে গেল, শব্দ নেই, কথা নেই, হৃৎপিণ্ডে সময়ের হাই-হীলের প্রতিধ্বনি।

হঠাৎ সমস্ত সঙ্কোচ জয় করে টেড বলে উঠল, 'লেট মী গেট ইউ সাম ফুড। আই বেট ইউ আর হাঙ্গরী মিস্—'

'কোলেট, সারা কোলেট।'

খাবার আসতেই সারা মাংস কেটে নিল ছুরি দিয়ে, অর্ধেকটা টেডের প্লেটে তুলে দিল। রুটির বড় একটা টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরে চিবোতে লাগল।

কৌতুকে, বিস্ময়ে চেয়ে আছে টেড।

খাওয়া শেষ হতে সারা ঢক ঢক করে জল খেল, মুখ মুছে লজ্জিত হাসল।

এতক্ষণে টেড স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেয়েছে, মনের ভিতরটা যেন ভিজে দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে ছিল, হঠাৎ জ্বলে উঠেছে।

মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'সারা, তোমার কে আছে।'

সারা জবাব দিল না। রক্তমুখ নখ দিয়ে হাতের আঙুল খুঁটতে লাগল।

'—কেউ নেই ?'

তেমনি, মাথা নিচু করেই, সারা ঘাড় নাড়ল।

কেউ নেই সারার, জন্মাবধি ছিল অরফ্যানেজে। বয়স বেশি হতেই কী একটা গোলমাল হল ওকে নিয়ে, মিশনরী সাহেবরা দূর করে দিলেন। যাকে নিয়ে এই কলঙ্ক, সে চম্পট দিয়েছিল আগেই। তারপর থেকে কত ঘাটে যে ভিড়েছে সারা, হিসেব নেই, ঘাটে ঘাটে শুধু জলই খেয়েছে।

টেলিফোনে কাজ পেয়েছিল, প্রাইভেট ফার্ম, সুইচ বোর্ড চিনতে চিনতেই কাটল মাস তিনেক. সেই তিন মাস শুখো। টেলিফোনের সুইচ বোর্ড থেকে রিসেপশনিস্ট।

বাধা দিয়ে টেড বলল, 'কিন্তু তোমার চেহারা ভাল। উইথ ইয়োর লুকস, ইউ শুড্যাভ ডান বেটার।'

ম্লান হেসে সারা বলল, "মেবী, আই ওয়াজ নট কাট আউট ফর এনিথিং বেটার—'

নইলে চেষ্টা তো সারা কম করেনি। রিসেপশনিস্ট যখন ছিল, তখনই টাইপ শিখেছে, ভর্তি হয়েছে শর্টহ্যাণ্ড ক্লাশে, হাড়ভাঙা খাটুনি, তবু পরিশ্রমের ত্রুটি ছিল না।

লক্ষ্য ছিল বড় সাহেবের স্টেনোর পোস্টটা।

পায়নি। যে পেল, তাকেও সারা চেনে, ম্যাগি—মার্গারেট হবসন—দি বস্‌ ইউজড টু টেক হার আউট টু ডিনার; দি জব ওয়াজ হার।

'তারপর ?'

তারপব একদিন সামান্য কারণে রিসেপশনিস্টের চাকরিটাও গেল। ম্যাগিই খেয়েছিল চাকরিটা, সারা জানে। তারপর থেকে সারা পা পিছলে কেবলই গড়াতে গডাতে গেছে, রেলওয়ে বুকিং অফিস, সেখান থেকে শপ গার্ল—

'কত পাও?'

কত আর। 'হার্ডলি এনাফ টু বাই মী এ ডিসেণ্ট ড্রেস। ভাল পোষাক কেনাব পয়সা জোটে কি জোটে না। সেই গ্ল্যামার আর নেই শিমলাব, দিল্লী থেকে অফিস আসে না, দোকানে বেচাকেনা প্রায় নেই, শুধু ট্যুবিস্টে আব কত হয়, একদা-মসৃণ ম্যলে খোয়া উঠে গেল, কেউ দেখে না, বিট্রেঞ্চমেণ্টেব নোটিশ ঝুলছে মাথার ওপর, তবু ভাগ্য, মাঝে মাঝে কেস জোটে—'

'কেস্? হোয়াট কেস্?'

চোখেব পাতা কাঁপতে থাকল সারাব, স্নায়ুভীতি দূর কবতে একটা সিগাবেট ধবাল, নীচু গলায় বলল, 'তুমি যেমন এসেছ।'

আহত কণ্ঠে টেড বলল, 'আমি কি তোমার একটা কেস্ মাত্র, সারা?' মৃদু হেসে সাবা দুটি চোখ নত কবল। ক্লিফ্‌টনেব হাত দিয়ে পাঠান স্টেলাব দুশো টাকা এখনও আছে ওব হাতব্যাগে। এই টাকায় একটি ফাব-কোট কিনবে সাবা, আর নীলন মোজা।

বাইবে ঝড থেমে এসেছে, সার্শিব ওপব শ্রান্ত জন্তুব নিঃশ্বাসেব মত ঘর্ঘব। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘেব ফাঁকে পীত-বিষন্ন একটুকরো চাঁদ, স্তব্ধ ওক গাছের ভিজে পাতায় জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি।

সিগাবেটটা অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলে সারা বলল, 'রাত শেষ হযে এল।'

উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিয়েছে সাবা, ঈষৎ জ্যোৎস্নালোকে ইথব ম্লান পিঙ্গল, নীচের পথে পাতলা ববফের মৃত্যুচ্ছদ, ঢেউয়েব পব ঢেউ তুলে পাহাড়ের রেঞ্জ কতদূরে চলে গেছে ঠিকানা নেই। বিদ্যুতেব টর্চ ফেলে যারা আকাশ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড কবেছিল, তাবা নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছে।

চোখ ফেবাতেই টেড দেখতে পেল সাবা ওব দিকে চেয়ে আছে।

'কী ভাবছ।'

বুক ভরে ফাব-ওক পাতাব গন্ধগুরু হাওয়া টেনে নিয়ে টেড আস্তে আস্তে বলল, 'ভাবছি, স্টেলাই শেষ পর্যন্ত জিতে গেল।'

পীত-মৃত চাঁদ ঢলে পড়েছে পাহাড়েব পিছনে, নীচেব দেবদারু গাছেব ঘন-রহস্য ছায়ায় শোনা যায় প্রথম ভোব-পাখিব কাকলি; অভ্র আকাশে প্রসন্ন সুন্দর শুকতাবা। হঠাৎ টেডেব মনে পড়ল, স্টেলা তাকে ছেড়ে গেছে। বিবাহ-ডোর ছিন্ন হতে আব বাধা নেই।

মূর্ছাতুর কয়েকটি মুহূর্ত, টক, টক, টক, স্পাইবাল সিঁড়ি বেযে সময়েব ওঠা শেষ হয়নি। আকাশেব কমনীয় নীল লালে-লালে ফেটে পড়ছে। নীচে ওৎ পেতে বসে আছে ওবা—হোটেলের ম্যানেজাব, খানসামা, স্টেলাব তবফের সাক্ষী। ওবা জানে এই হোটেলেব কামবায় টেডের বাত কেটেছে, আব সে কামরায় টেড একলা ছিল না। অকাট্য প্রমাণ। এই একটি প্রমাণেব জোরেই মিথ্যে হয়ে যাবে একটি সম্পর্ক, · স্টেলা হযত, হয়ত নূতন করে সংসাব বচনা কববে ড্রেককে নিয়ে। করবে কেন, কে জানে এখনই হয়ত একসঙ্গে আছে ওবা, হয়ত এই মুহূর্তে টেডকে নিযে হাসাহাসি কবছে। মস্তিষ্কেব মধ্যে একসঙ্গে হাজার মৌমাছিব গুঞ্জন উঠেছে, ভগ্ন, শ্রান্ত, কম্পিত কণ্ঠে টেড বলে উঠল, 'আই'ম্ এ লস্ট ম্যান, সাবা।'

সারার ঠোঁট দুটি কাঁপল, কী যেন বলতে চাইল, পারল না।

দরজা খুলে দাঁড়াল টেড, ক্রাচে ভর দিয়ে বলল, 'চলি !'

সেই গোলকধাঁধা করিডর, দুধারে নম্বরী খুপরির সারি। নীচে ওকে দেখে ক্লার্ক উঠে দাঁড়াল, বিচিত্র হেসে অভিবাদন করল ম্যানেজার। সদর দরজার সমুখে এসে টেড এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। একের বদলে আর ফিরে পেল স্টেলা, অনায়াসে ছেঁড়া জুতো বদলানর মত। কিন্তু টেড কি পেল। এই পথ গেছে কোন আমস্-হাউস বা ইনফার্মারিতে, সেখানেই জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিলে তিলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে কাটবে। শিরশিরে একটা অনুভূতি নামল মজ্জা বেয়ে, ওরা তো মাই হার্টকে গুলী করে মেরেছিল, টেডকে বাঁচিয়ে রাখল কেন। 'এ লস্ট ম্যান, এ লস্ট ম্যান,' বিড বিড করে বারবার বলল টেড, দু চোখ জলে ঝাপসা, আস্তে আস্তে পথ ঠাহর করে এগোতে লাগল।

ওর পিছে পিছে নীচে নেমে এসেছিল সারাও। ম্যানেজার ওকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'এভরিথিং ও-কে ?'

বরফঢাকা ঢালু রাস্তা, পঙ্গু একটি মানুষের দেহ দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে সারা হঠাৎ বলে উঠল, 'এখনও একটু বাকী আছে।'

দুশো টাকা গুঁজে দিল ম্যানেজারের হাতে, বলল, 'স্টেলাকে দিও' , কোন প্রশ্ন করার অবকাশ দিল না, সারা ছুটতে শুরু করল।

*   *   *   *

ফিরে দাঁড়িয়ে টেড বলল, 'একী।'

শক্ত করে ওর কনুই ধরল সারা। এইটুকু পথ ছুটে আসার পরিশ্রমে

মুখ টকটকে। নীচু কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলল, 'তোমাকে বাকী পথটুকু পার করে দিতে এলাম।'

সে-মুখে টেড কী দেখল সেই জানে। কিছুটা অবিশ্বাসী, কিছুবা অস্থির গলায় বলে উঠল, 'বাট্ আই'ম এ লস্ট ম্যান, সারা।'

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এল সারা, মৃদুকণ্ঠে বলল, 'হোটেলেও একথা বলেছিলে। তখন বলতে পারিনি—এখন বলি। আই'ম্ এ লস্ট গার্ল টু।'

পায়ের চাপে বরফ গুঁড়ো হয়ে গেল, এখানে চড়াই। হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে বিস্মিত ম্যানেজার দেখল, আলো-অন্ধকারে দুটি মূর্তি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, পঙ্গু আর পতিত দুটি সত্তা।

আর একটু এগোলেই সেই মোড়, লোকে যাকে বলে স্ক্যাণ্ডাল-পয়েণ্ট। কিন্তু ওরা বুঝি স্ক্যাণ্ডাল-পয়েণ্টও ছাড়িয়ে যাবে।

জোড়-বিজোড়

বাবা মারা গেলেন এপ্রিলে আর ম্যাথুসরা এ বাডিতে এল জুলাইয়ে। এ দু'টি দিনই সুসানের স্পষ্ট মনে আছে। বাবাব মৃত্যুদিনটিব কথা মনে আছে, কেননা তাব পবে তাকে আর তার মাকে কালো পোশাক পরতে হয়েছিল। আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে পাউডাব ছুঁইয়ে চোখের জলেব ভিজে দাগটুকু মা সন্তর্পণে মুছে নিয়েছেন, আব সুসানেব দিকে ফিবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, এই পোশাকটাতে আমাকে মানায় সু' ?

—চমৎকার মানায়, মা।

মা ঈষৎ চমকে উঠে বলেছেন, দূর ওরকম অলক্ষুণে কথা বলতে নেই। ঈশ্বব করুন, এমন পোশাক আব কাউকে যেন কখনো পবতে না হয়। বাবাব জন্যে প্রার্থনা কব সু', আহা তাঁব দেহ কফিনও পায়নি।

বলতে বলতে মা'ব চোখ দুটো ছল ছল কবে উঠেছে, হাতখানা অভ্যস্ত বীতিতে টেবিলেব ওপরে বাখা পাউডাবেব পাফ্‌টাব দিকে এগিয়ে গেছে।

প্রার্থনা। চোখ বুঁজেও সুসান কিন্তু বাবার চেহাবা মনে আনতে পাবেনি। বেলেব পোশাক, মাথাব টুপিটি, হাতেব লাল নীল আলো, এমন কি পকেটেব হুইস্‌লটা চোখে ভেসে উঠেছে, কিন্তু কিছুতে মনে পডেনি সেই মানুষটিব নাক-মুখ চোখ কেমন ছিল।

—বাবাব মুখখানা মনে কবতে পাবছি না যে মা! সুসান অসহায় কণ্ঠে বলেছে।

—চেষ্টা কর পারবে। গম্ভীর গলায় মা বলেছেন, তোমার বাবা খুব লম্বা ছিলেন। মুখখানা ওঁর ছিল টকটকে টোম্যাটোর মত লাল আর জামার নীচে ঢাকা শরীরের রঙ ছিল বরফের মত শাদা।

চোখ বুঁজে আরেকবার চেষ্টা করেছে সুসান। এবারে ভেসে উঠেছে, কয়েকটা বিধ্বস্ত বগী, নিবিড় অন্ধকার, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাঠ আর লোহার টুকরো, তুমড়ে যাওয়া ফিস্‌প্লেট,—আর আর,—খানিকটা দূরে, ডিচের ধারে একটা দেহকে নিয়ে গোটাকতক কুকুরের টানাটানি। ওর বাবা, রিচার্ড ওয়েক, এক রেল-দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। দিলদারনগর আর বক্সারের মাঝামাঝি সেবার আপ পাঞ্জাব মেলের পিছনের কয়েকটা গাড়ি লাইন-ছাড়া হয়ে গড়িয়ে পড়ে। সেই গাড়িতে গার্ড ছিলেন ওর বাবা। কিন্তু তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সেই ভয়ঙ্কর সকালটির কথা মনে আছে। খবরের কাগজে সংক্ষিপ্ত খবরটুকু দেখেই মা ছুটেছিলেন হাওড়ায়। সুসান পিছনে পিছনে। তারপর শুরু হল ফোন করার পালা। হেলো দানাপুর, হেলো মোগলসরাই, এনি নিউজ, এনি ডিটেল্‌স্?—মা'র কাঁপা কাঁপা গলার জিজ্ঞাসা মনে আছে,—হেলো, হেলো—ইজ দ্যাট্ মোঘালসেরাই, কুড ইউ স্পট—দিস ইজ মিসেস ওয়েক স্পীকিং—আই সে কুড ইউ স্পট্ ডিক্—মিঃ রিচার্ড ওয়েক—'মং দ্য ক্যাসুয়ালটিস? নো? ডিড্ ইউ সে নো? হেলো, ইজ দ্যাট্ দানাপুর—হেলো, হেলো···ও হেল্।

লাইনটা বুঝি কেটে গেছে, নাকি মা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন না। সুসান ফোন্‌টা নিয়ে নিজের কানে লাগাতেই ওপার থেকে পরিষ্কার গলা

ভেসে এল ঃ ইজ ছ্যাট মিসেস ওয়েক ? এ্যাম এ্যাফ্রেড মিসেস ওয়েক, বিচার্ড মাস্ট বী প্রিজিউম্‌ড ডেড্‌।

—ডেড্‌! চীৎকাব কবে উঠেছিল স্থসান, হাত থেকে ফোনটা পড়ে গিয়েছিল।

ডেড্‌! মিসেস ওয়েক তীব্রতব চীৎকাব কবে উঠেছিলেন। ওঁব মুখে এক ফোঁটা রক্ত ছিল না।

তাবপর ট্র্যাক আবাব পবিষ্কাব করাব পালা। ক্রেনে করে ভাঙা গাড়ির টুকবো কুড়িযে ওয়ার্কশপে নিয়ে যাওযা হ'ল, কিন্তু রিচার্ড ওয়েকের কোন চিহ্ন নেই। দিনকতক তাব এল সহানুভূতি জানিয়ে, অসংখ্য তাব। রেলওয়ে বোর্ডেব চেয়াবম্যান, ই. আই আর.-এব এজেণ্ট। আম্বালার লুসি মাসি, ওভাবসীজ থেকে বিল আব বারবাবা। মা সে-সব পড়েছেন, আব ছুঁড়ে ফেলেছেন বিতৃষ্ণায়। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আব কম্‌পেনসেসনেব টাকাব জন্যে ছুটোছুটি কবেছেন।

একদিন ফেযালি প্লেস থেকে মা শুকনো মুখে ফিবে এলেন। ওবা কম্‌পেনসেসনেব টাকা দেবে না বলছে স্থ'।

—কেন, মা ?

মৃতদেহ পাওযা যায়নি বলে।

—তাই বলে টাকা দেবে না ?

—তাই তো বলে। অবশ্য আমি এখনো হাল ছাড়িনি, মা বললেন, দবকাব হয়তো এ নিযে হোম গবর্ণমেণ্টকে পর্যন্ত মুভ কবব।

আব প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ? তাও আছে সামান্যই। বিচার্ড মদ খেত বে-হিসেবি, আব ময়দান-টালীগঞ্জ-বাবাকপুব ; লেবং, মহালক্ষ্মী, লখ্‌নৌ,

এমন কি নিউ মার্কেট, এ্যাসকট, কোন ঘোড়দৌড়ের বাজি পারতপক্ষে বাদ দিত না। নানান্ ছুতোয় ধার করে প্রভিডেণ্ট তহবিল প্রায় খালি করে এনেছিল। সামান্য কয়েক হাজার টাকা মাত্র পড়ে আছে।

মা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ইতিমধ্যে খবরের কাগজের মারফৎ জানা গিয়েছিল দুর্ঘটনার বিস্তৃততর বিবরণ। কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করেন, এর পিছনে গুপ্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আছে।

যাঁরা সমবেদনা জানাতে আসেন, তাঁদের সঙ্গে এ-নিয়ে মার আলোচনা চলে। আপনি বলছেন মিঃ আণ্ড্রুল, এ্যানার্কিস্টরা এ কাজ করেছে? নেটিভ এ্যানার্কিস্টরা? কপালে চোখ তুলে নড়ে চড়ে বসেন মা। শুনলে ক্লারা, শুনলি স্থ'? তোর বাবার মৃত্যুর জন্যে নেটিভ এ্যানার্কিস্টরাই দায়ী। হে ঈশ্বর, কবে যে এই হিদেন আর এ্যানার্কিস্টদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবে জানিনে।

চাপা গলায় আলোচনা চলে। এবারে কী হবে। এই ধর্মজ্ঞান-হীনদের শায়েস্তা করবার জন্যে কী করবেন সরকার। প্রাইম্ মিনিস্টার? হিজ ম্যাজেস্টি? হোআট ইউ থিঙ্ক হিজ ম্যাজেস্টি উইল ডু? কিছু না? প্যাট্রিক, তুমি বললে কিছু না? ও প্যাট, প্যাট, ডোণ্ট ইউ বী সিলি। আমাদের জীবন বিপন্ন, আর হোম গবর্ণমেণ্ট চুপ করে বসে তাই দেখবেন? ব্রিটিশ ন্যাশন্যালদের সাহায্য করবেন না?

—ব্রিটিশ ন্যাশনাল!

—নই? কেউ যেন মুখের উপর বাইবেলের পবিত্রতায় সন্দেহ করেছে, মিসেস ওয়েক এমনি মুখভঙ্গী করেন। ব্রিটিশ ন্যাশন্যাল নই?

হোআট এলস ইউ থিঙ্ক উই আর ? সামান্য আয়োজনের ত্রুটিতে হোম-এ জন্মাইনি বলেই আমবা ব্রিটিশ ন্যাশন্যাল নই, আশা করি তুমি তা বলছ না। ইউ ডোণ্ট সজেস্ট দ্যাট, ডু ইউ।

বাস্তবিক, মা সেদিন পর্যন্ত স্বপ্ন দেখেছেন, দুষ্কৃতদের বিনাশেব জন্যে এক ঝাঁক 'বমাব' আসছে বিলেত থেকে—জাস্ট এ স্কোযাড্রন অব্' দেম্ 'লল্ ডু, ইউ নো। সাবা শহবে বোমা পডছে,—দোজ বাস্‌টিজ এ্যাণ্ড নেটিভ এবিয়াজ—। কেবল পডেনি ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, আর রিপন স্ট্রীট, ডাবামটোলা আব সার্কুলাব বোড, পার্ক স্ট্রীট, সাডাব স্ট্রীট আব কীড্ স্ট্রীটে। আর চৌবঙ্গীতে। 'থোর্স চাউ-রিন্-ঘি। আওয়াব গুড্ ওল্' চাউ-রিন্-ঘি।

হ্যাবল্ড বলে, এইচ এম জি তো বলেই দিয়েছেন, আমাদেব নিয়ে ওঁদেব বিশেষ কোন দাযিত্ব নেই। আমবা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানবা, যেন নিজেদেব ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল মনে কবি। ইন পয়েণ্ট অব ফ্যাক্ট, ওঁবা ইণ্ডিযান লীডাবদের সঙ্গে সেট্‌লমেণ্টেব জন্যে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছেন।

ইণ্ডিযান ন্যাশন্যাল ? মিসেস ওয়েককে আব একবাব পাউডাবেব পাফ্ দিয়ে ঘাম মুছতে হল। এইচ. এম জি. বলেছেন এই কথা ? হাউ সিলি অব' এম। সীমস্ ইটস্ হেল্যুভা মেস্ আপ দেয়ার, এ্যাট হোম। মিসেস ওযেক সাতপুরুষ এদেশে থেকে নেটিভ বনে গেছে এমন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নন।—আমাব বাবা কলিয়াবীব জববদস্ত সাহেব ছিলেন, আর আমার মা—ওয়েল সী ওয়াজ—

কথাটাকে সম্পূর্ণ না কবেই থেমে যান। ওঁব মা কে ছিলেন, মিসেস ওয়েক নিজেই বুঝি জানেন না, বা জানলেও জানাতে চান না। এ্যালবামে

অসংখ্য প্রতিকৃতি আছে ওঁব বাবাব, নটিংহ্যমেব পিট্ থেকে যিনি একদিন উঠে এসে ধানবাদ-বোকারো বার্মো কোল-বেল্টে পঁচিশ বছর একচ্ছত্র আধিপত্য করেছিলেন। কিন্তু মায়েব ছবি নেই একটাও। এই এ্যালবাম সুসানও কয়েকবার দেখেছে। বাংলোব বাগানে বাইফেল হাতে শালপ্রাংশু মহাভুজ যে শ্বেতকায় ভদ্রলোক দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, তিনিই মিঃ হিউজেস্,—মার বাবা। আর সেই ছবির অনেক পিছনে ঝাপ্‌সা মতন দেখা যায়, জন কয়েক স্ত্রীলোক কয়লাব ঝুড়ি কাঁধে, নুয়ে পড়ে, বেলওযে সাইডিং-এর দিকে চলেছে। তাদের মুখ দেখা যায় না, কিন্তু আঁটো-খাটো কাপড়ের ফাঁকে গায়ের বং নিকষ কালো। এদেবই একজন কি ওব মায়েব মা?

ইণ্ডিয়ান লীডাবদের সঙ্গে মীমাংসা! মিসেস ওযেক আবাব পুরনো কথাব জেব টানলেন,—ইণ্ডিযান্‌স্! হোয়াই, দে কাণ্ট হাফ-স্পীক ইংলিশ।

এই যে আশে পাশে যাদেব দেখছেন এবাই তো ইণ্ডিযান? চাবুক হাতে ঘ্যাবীওয়ালা, যাবা দবদস্তুব নিয়ে দিনে দুপুরে ডাকাতি কবে; মিউনিসিপ্যাল মার্কেটেব ডিসঅনেস্ট ভেণ্ডার্স, হাওডা স্টেশনেব থ্রিগ্ পোর্টাস্, অ্যাণ্ড দোজ স্লোভেনলী বাবুর্চিজ। এদেব প্রতিনিধি—সেই এজিটেটবদের সঙ্গে আলোচনা? ওয়েস্টমিনস্টারের স্টেট্‌সম্যানসিপ না থাক, প্রেস্টিজ বোধও নেই নাকি। আব ডিসেন্‌সি?

কথায কথায় কথা বাড়ে। কেউ কেউ বলে, এসব কথা ছেড়ে দাও। লে'টস ডিসকাস সামথীং এলস্। এবাব ও'ক্সে কী আপ্‌সেট হল। গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যালের এ্যাক্‌সেপ্‌টেন্স দেখছ, ডোণ্ট ইউ থিঙ্ক দি হ্যাণ্ডিক্যাপস্ ওয্যাব

এ ট্রাইফ্‌ল আনফেয়ার। ভাবিতে কি হবে এবার। রিচার্ডস্‌,—পুওর গর্ডন—হ্যাজ ইয়েট টু মাউণ্ট এ উইনার।

বাবা মারা গেলেন এপ্রিলে। ম্যাথুসরা এ বাড়িতে এল জুলাইয়ে। এ দিনটিও সুসানের মনে আছে, কেননা যদিও তখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, তবু সেই সময়েই মা পাখা দুটো বেচে দিলেন। জানালা থেকে খসখসের পর্দা ইতিমধ্যেই তিরোহিত হয়েছিল। ধূলোর লজ্জা লুকোবার জন্যে মেজেয় একটুকরো কার্পেটও অবশিষ্ট ছিল না। বিনা মাখনে রুটি, বিনা চিনিতে চা, যৎসামান্য খাদ্যে লাঞ্চের নামে পেটের লাঞ্ছনা, সবই অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল। বাবা আর ফেরেন নি। বেলকোম্পানী থেকে মেলেনি ক্ষতিপূরণ। মা অনেক লেখালেখি করেছেন, সে-সব দরখাস্ত এখন সরকারী দপ্তরে, নিষ্ফল ফাইলে, লালফিতে গড়িমসির ফাঁসে।

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা যত ফুরিয়ে আসে, মা'র মেজাজ চড়ে তত। প্রতি শনিবার দু'নো টোটের টোপে মোটা রকম টাকা গেঁথে তোলবার বিফল চেষ্টা চলে। রবিবার সকালে সেই শোক ভুলতে নিয়মিত হাজিরা দেন গীর্জায়।

সুসান সব দেখে। গীর্জায় গিয়ে কী প্রার্থনা করেন মা? হে ঈশ্বর, আমাকে একটা মোটা রকমের বাজী মিলিয়ে দাও, আর যে আমাদের ফেলে পালিয়েছে তাকে শাস্তি দাও?

মার মনে কেমন ধারণা রিচার্ড দুর্ঘটনায় মারা যায় নি, পালিয়েছে। হয়ত আগে থেকে টের পেয়ে লাফিয়ে পড়েছিল··

—কিন্তু পাঞ্জাব মেল, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল ছুটছে······

—ও সব পারে। মা বললেন। নাই পালাবে যদি, তবে ওর লাসটা পাওয়া গেলনা কেন।

ইতিমধ্যে একদিন ম্যাথুসরা এল। মা বললেন, বাইরের ঘরটা ভাড়া দিয়ে দিলাম স্থ'। এত বড় বাসাটা আমাদের লাগেনা তো। আমরা তো দু'জন মোটে, একটা ঘরেই হয়ে যাবে। ওরাও দু'জন। প্যানট্রিটা পার্টিসন করে দেব। স্কালারিটা দু'জনেরই থাকবে। আর লিভিং রুম একটা।

একটি তো মোটে ঘর, থাকবে দু'টি প্রাণী। এর জন্যে ম্যাথুসকে ভাড়া দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা।

'মিঃ ম্যাথুস সিনিয়র সার্জেণ্ট একজন,' মা বললেন, 'পুলিশের কাজ, ও-তো টাকা দেবেই। কত কাঁচা পয়সা আসে ওর। তোর বাবাও অনেক টাকা উপরি পেত। ঈশ্বর ওঁর আত্মার—'

ছোট করে ছাঁটা চুল, কিন্তু কোঁকড়ান। অতি উঁচু নাকটার নীচে চোখ দুটো পাহাড়ের ছায়ায় হ্রদের মত। সোজা হয়ে দাঁড়ায় যখন, টুপিটা সিলিং ছোঁয়-ছোঁয়। আর ওর বৌ এমিলি, রোগা সিড়িঙ্গে মেয়েটা, উঁচু গোড়ালি জুতো নিয়েও পৌঁছতে পারে না স্যামুয়েল ম্যাথুসের কাঁধ অবধি।

বিকেলে আবার একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া হয় দু'জনের। সুসানের তখন হাসি চাপা দায়। ম্যাথুসের কনুই ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে এমিলি। হে মা মেরি, মেয়েটা হোঁচট খেয়েও পড়ে না একবার।

তারপর আলাপও হ'ল একদিন। মাকে আর সুসানকে ওরা চায়ের নিমন্ত্রণ করল। এসব ব্যাপার সুসানের অদৃষ্টে বড় একটা ঘটে না, আর বাবা মারা যাবার পর থেকে ওসব তো চুকেই গেছে।

প্রাথমিক পরিচয়াদি হ'ল। মা কথা বলছেন এমিলির সঙ্গে। স্যামুয়েলের পাশে সুসান। মৃদুস্বরে আলাপ শুরু হ'ল। স্যামুয়েল দেশ-বিদেশে ঘুরেছে অনেক। পেশওয়ার থেকে কালিকট। অবশেষে এই আর্মড্ কনস্টাবুলারি, কলকাতা পুলিশে চাকরি, এর মত বিশ্রী কাজ আর নেই, কী বলেন।

নেই? সুসান অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, আড়চোখে তাকিয়ে দেখল স্যামুয়েলের পোশাক।

স্যামুয়েল বললে, ওই পোশাকটাই যা জমকালো। আর কী। সময় অসময়ের চাকরি, ভাল লোকেরা মন্দ ভাবে, মন্দ লোকেবা শত্রু।

সুসান অন্যমনস্ক ভাবে বললে, ও।

—তা ছাড়া পারিবারিক জীবনও সুখের হয় না। সামাজিক জীবন তো নেই-ই।

—নেই বুঝি।

—আছে কোথায় বলুন। এমিলি কাজ করে টেলিফোনে, ওর যখন ডিউটি তখন হয়ত আমার ছুটি, ওর ছুটির সময় আমার কাজ।

সুসান বললে, ও।

সেদিন আর কোন কথা হয়নি। তার পরে আরো ক'দিন না। তাই বলে সুসান কি আর ওর ঘর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেনি ওদের ঘরকন্না। কোনাকুনি জানালাটার পাশে দাঁড়ালে সব দেখা যায়।

এই তো সকাল এখন সাতটা। সিঁড়ি দিয়ে এমিলির নেমে যাওযার শব্দ হ'ল। ওর বোধ হয ডিউটি। স্যামুয়েল দেয়াল-আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছে। চোথ দু'টি অল্প অল্প ফোলা, সেটা পরিপূর্ণ ঘুমেও হতে

পায়ে, আবার অপূর্ণ বিশ্রামেও। ডোবাকাটা হালকা গৃহবাসে স্যামুয়েলকে এমন অদ্ভুত দেখায়। শরীরের পেশিগুলো পর্যন্ত যেন স্পষ্ট। সুসানের অস্বস্তি লাগে, চোখ ফেবেনা তবু।

এবারে বুঝি স্যামুয়েল স্নানের ঘরে গেল। ধারাযন্ত্র খুলে দেবাব পর ঝর্ঝব অনর্গল শব্দ আসছে। এ-শব্দ থেমে গেলেও অনেকক্ষণ ধবে কুলকুল বাজবে কানে।

মা কখন পিছন থেকে এসে উঁকি দিলেন। জানালায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধবে কী দেখিস বে। —ও: মি: ম্যাথুসকে। ওদের এর মধ্যে ছোট হাজবি হয়ে গেছে ? এমিলি অফিসেও চলে গেছে ? বলিস কী।

স্যামুয়েল ততক্ষণ স্নান সেরে ফিবে এসেছে। আয়নাব সমুখে দাঁড়িয়ে শুকনো তোয়ালে দিযে গা মুছছে, ধবধবে পিঠটা কী আশ্চর্য লাল। পুরুষেব খালি গা সুসান এই প্রথম দেখছে না, অন্তত বাবাকে দেখেছে, কিন্তু বাবাব বয়স হয়েছিল, আব মদ খেয়ে খেয়ে শরীবের বাঁধুনি ছিল না।

স্যামুয়েল চুল আঁচডাতে আঁচড়াতে শিষ দিচ্ছে। হঠাৎ একবাব পিছন ফিরে চাইতেই সুসানের সঙ্গে চোখোচোখি হল। সুসান সরে এল সেখান থেকে।

ক্রিং ক্রিং। সদরে সাইকেলেব শব্দ। স্যামুয়েল বেবিয়ে গেল।

দুপুবের খাওয়াব আয়োজন দেখে চোখে জল এসে যায় সুসানের। কয়েক স্লাইস রুটি, তাতে মাখন আছে কি নেই, সামান্য একটু তবকাবি সিদ্ধ আর কফি। এই খেয়ে সারাদিন ? এই সবে একটা বেজেছে, তিনটে বাজতে বাজতেই পেটেব মধ্যে একটা চিনচিনে ব্যথা শুরু হবে। বিকেলেব দিকে মাথা ঘুরবে, পার্কেব ঠাণ্ডা হাওয়াতে বসেও যাব উপশম হবে না।

মন খারাপ হতে শুরু করে সন্ধ্যার পর। গলির শেষে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের সদরে এখন সান্ধ্যবিপনি জমে উঠেছে। সাইকেলের অধীর ঘণ্টা বাজিয়ে কে তার প্রণয়িণীকে সমুখে বসিয়ে ময়দানে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে গেল। সিগারেটের দোকানের সামনে অনেকক্ষণ ধরে অলস একটা ট্যাক্সি এতক্ষণে হর্ণ বাজাতে শুরু করেছে। কে জানে এখন নিউ মার্কেটের বাইরে, লিণ্ডসে স্ট্রীটের ঘড়িতে রাত কত।

এত সাজ, এত আলো, এত খুশির ঢেউয়ের পাড়ে স্থসান একা। ভ্রুক্ষেপহীন গতিবান একখানা ট্রেনের পথের পাশে মৃতনিথর পাথরের প্ল্যাটফর্মের মত। পাশের ঘরে এমিলি এসেছে। এ-ঘরে আলো নেবান, শুধু ওঘরের স্কাইলাইট চুইয়ে আসা কয়েকটা রশ্মিতে অন্ধকার একটু ফিকে। খিল খিল গলা শোনা গেল এমিলির, যে গলায় সারাদিন চোখে দেখতে না-পাওয়া নম্বরপ্রার্থীদের 'এনগেজ্‌ড' বলেছে, সেই গলা এখন স্যামুয়েলের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপমুখর। কী এত কথা বলছে ওরা। স্যামুয়েল কি বলছে আজ ক'জন গুণ্ডাকে শায়েস্তা করেছে সেই কাহিনী? আর এমিলি ডিভানটার ওপর কাৎ হয়ে গড়িয়ে পড়ছে সেই কথা শুনতে শুনতে; নাকি আজ ক'জন লোককে ভুল নম্বর দিয়ে জব্দ করেছে সেই গল্প বলে বাহবা নিচ্ছে। ওদের প্যানট্রি থেকে আসছে মশলার ঝাঁঝাল গন্ধ। মাংস ভাজা হচ্ছে নিশ্চয়ই।

তবু যখন সিঁড়ির মুখে কখনো কখনো দেখা হয়ে যায়, স্থসানের মুখে কথা ফোটে না। ক্ষয়ে-যাওয়া হীল তু'টো কাঁপতে থাকে; হাঁটুর কাছে, স্কার্টটা যেখানে ছেঁড়া, সেখানটা আপনা থেকেই চোখে পড়ে। ঈশ্বর জানেন, স্যামুয়েলের চোখ এখন কোথায়।

—গুড মর্ণিং মিস ওয়েক।

—’মর্ণিং মিঃ ম্যাথুস।

—ফাইন ডে, ইজ্‌ন্টিট্‌ ?

—ফাইন।

আলাপের নটেগাছটি মুড়োয় ওখানেই। আর কী কথা থাকতে পারে। আর কী বলতে পারে একজন আরেকজনকে, সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে, পাশ কাটিয়ে উঠতে গেলেও যেখানে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবার ভয়।

সেই ভয় ভাঙল একদিন আশ্চর্য রকমে। মা কোথা থেকে টিনের শুকনো মাংস জোগাড় করেছিলেন খানিকটা, দুপুরটা তাই খেয়েকে টেছে। কিন্তু সন্ধ্যা আর কাটে না। মা কোথায় বেরিয়েছেন, ফেরেননি এখনো। ওদের ঘরও চুপচাপ। কোথায় একটা নাচের আসর আছে, এমিলি আর স্যামুয়েল সেখানে।

সুসান পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল। সিঁড়ির মুখে একটা আলো মিট মিট জ্বলছে, দিলে নিবিয়ে। হাতে চাবির গোছা বাজল একবার। অন্ধকারেও ল্যাচ্‌-কির ফোকর খুঁজতে কষ্ট হ’ল না। মসৃণ কার্পেট, টিপয়, টেবিল, পিয়ানো, সেটি। ওই তো কাঁপছে পর্দাটা, যার ওপাশে প্যানট্রি। মীটসেফের জালের ফাঁক দিয়ে রোষ্টের মাতান আঘ্রাণ।

সুসানের চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল। কিন্তু অন্ধকারে চোখেরই বা প্রয়োজন কী। কাঁপলেও হাত পৌছয় ঠিক। এমিলি স্যামুয়েল ফিরে এলে টের পাবে ? পেলেই বা। বাইরের দরজায় চাবি থাকলেও রেনওয়াটার পাইপ দিয়ে ইঁদুরের আনাগোনা ঠেকাবে কে।

বহুকাল-বিস্মৃত আস্বাদ নতুন করে পাওয়ার আনন্দে স্থসান বলতে যাচ্ছিল 'আঃ'। কিন্তু "উঃ" ছাড়া কিছু বেরুল না। প্রবল মুঠিতে কে যেন ওর কাঁধটা চেপে ধরেছে।

'কে ?' চকিত আর্ত গলায় স্থসান প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

'এ-প্রশ্নটা তো আমার করবার কথা।' ভারী গলায় কে বলে উঠল। স্বরে ক্রোধের চেয়ে বেশি কৌতুক।

অমন বজ্রমুঠিতে বাঁধা পড়ে আছে, তবু স্থসান কেঁপে উঠল। বুঝতে পেরেছে। জানালায় দাঁড়িয়ে চুরি করে দেখা স্যামুয়েলের সবল পেশিগুলোকে চেনা যাচ্ছে এখন।

—আমি, স্থ-স্থসান। মাপ করবেন মিঃ ম্যাথুস, এ-ঘরে কী একটা শব্দ হল তাই দেখতে—কিন্তু আপনি নাচ দেখতে যাননি ?

—নাচ ? ও-হো সে তো ভেঙেছে সাড়ে আটটায়। এমিলির নাইট ডিউটি, সে চলে গেল। আমি ফিরে এলুম।

আলোটা, স্থসানের তখন মনে হয়েছিল, জ্বালা থাকলে ভাল হ'ত। স্যামুয়েলের মুখটা দেখা যেত ভাল করে। একটু আগে যে হাতখানা মীটসেফের ছিটকিনি ছুঁয়েছিল, সেটা দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেললে স্থসান, তবু বুঝি মুখের ওপর স্যামুয়েলের তপ্ত নিঃশ্বাস।

"এমিলির আজ নাইট ডিউটি" কথাটা কি আরেকবার বললে স্যামুয়েল, নাকি স্থসান প্রথমবারের কথাটারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেল।

আলো নেই। ক্ষতি নেই। চেনা ঘর, শরীরও চুরি করে চেনা। আলো লাগে না। তবু স্থসানের চোখ কান্নায় ভরে গেল। এই অন্ধকারে

ও-ঘরের মিটসেফটার অস্তিত্ব অস্পষ্ট। স্যামুয়েল যদি একবার রোস্টটা চাখতে দিত। একটিবার।

প্রথম প্রথম ভয় ছিল এমিলিকে, মাকে। মা কিন্তু কিছু বলেননি। সেদিন রাত এগারোটার সময় চীনে মাটির প্লেটে ঢাকা মাংস হাতে করে ঘরে ঢুকে সুসান দেখল মা চুপ করে আলো জ্বালিয়ে বসে আছেন। ওর দিকে তাকালেন একবার, কিছু বললেন না। হাঁটুর কাছে আরো একটু বেশি ছেঁড়া ফ্রকটার জন্যে সুসানের সঙ্কোচের অবধি ছিল না, মা তবু কিছু বললেন না।

কলঘরে মুখ ধুয়ে এল সুসান, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল, তবু মা কিছু বললেন না। শেষে প্লেটে খাবার সাজিয়ে সুসান মাকে আস্তে আস্তে ডাকলে।

মা উঠে এলেন। রোস্টটা নির্ভুল বখরায় কেটেও নিলেন। কে জানে, মা সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন কি না।

পরদিন সকালে মা যখন বললেন, ওদের ঘর থেকে জমান দুধ চেয়ে নিয়ে আয়, সুসানের তখন পা সরছিল না।

স্যামুয়েল ঘরে নেই, এমিলি সবে রাত জেগে চোখ লাল করে বাসায় ফিরেছে। ওকে বসতে বলে এমিলি মুখ ধুয়ে এল।

—একটু দুধ, বললে সুসান।

—দুধ? দাঁড়াও দেখছি।

ফিরে এসে এমিলি বললে, জানো সু, কাল ভারি মজার ব্যাপার ঘটেছে।

ডিয়ার স্যাম মাস্ট হ্যাভ হ্যাড এ বিস্টলী এপেটাইট—একাই সবটা রোস্ট খেয়েছে, জাস্ট ফ্যান্সি। কাল ওখানে নেচেছিল খুব, ড্রিঙ্কও করেছিল, খায়নি প্রায় কিছুই; এ্যাণ্ড ইউ নো ডান্স ইজ দি থিং ছাট গিভ্স্‌য্য এপেটাইট।

ঠিক তিনদিন পরে দুপুর বেলা সুসান ঠক ঠক শব্দ শুনতে পেল। দরজা খুলে দিতেই দেখা গেল স্যামুয়েল দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে স্যামুয়েল একটু হাসল। শুধু সৌজন্যের হাউ-ডু য়ু-ডু হাসি নয়, তাতে ঈষৎ মোহের সঙ্গে দুষ্টুমির খাদ। মিসেস ওয়েক যদি অনুমতি দেন তবে সুসানকে নিয়ে ও একটা নামী ছবি দেখতে চায়।

—ও ম্যাথুস, মাই চাইল্ড, ইউ আর সো ফ্রাইটফুলি ফর্ম্যাল। সুসান, আই'ম সিওর, সী'ড্ লাভ টু গো আউট; ও'ন্ট ইউ, সু' ডিয়ার।

মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানালে সুসান। মিসেস ওয়েক বললেন, আই অলমোস্ট নিউ ইউ উড্। ইট উইল ডু ইউ গুড টু। পিকচার্স আর সো এডুকেটিভ।

ফিরে আসার পথে, মিসেস ওয়েক বললেন, যদি মার্কেট ঘুরে আসিস সু'। জ্যাম, জেলি, বিস্কুট, রুটি, সব ফুরিয়েছে, টাকা নিয়ে যা।

মা টেবিলের টানার ভিতর, বালিশের নীচে, ছবির পিছনে, সম্ভব অসম্ভব সব রকম জায়গায় টাকা খুঁজতে লাগলেন। আর শপথ উচ্চারণ করতে লাগলেন একে একে। ক্রাইস্ট, হোয়াট্যাভ্ আই ডান উইথ দি লট? দেয়ার ওয়্যার নোটস্, দেয়ার ওয়্যার কয়েনস্, স্মল চেঞ্জেস টু। ও হেল। টাকাটা বাইবেলের ভেতরেও নেই? আই উড সুনার থিঙ্ক আই'ম নট ইন দিস রুম।

আস্তে আস্তে পাইপে অগ্নিসংযোগ করল স্যামুয়েল, তারপর বললে, ডোণ্ট ওরী, মিসেস ওয়েক। আই সাপোজ আই হ্যাভ সাম স্মল চেঞ্জেস—উইল ছাট ডু?

গদ গদ কণ্ঠে মিসেস ওয়েক স্যামুয়েলকে ধন্যবাদ দিতে থাকলেন। সুসান ততক্ষণ তৈরী হয়ে নিয়েছে।

মিড্ প্যাসিফিকের একটি পরিত্যক্ত দ্বীপে আদিবাসীদের হাতে শ্বেতাঙ্গ তরুণীর নিগ্রহের ছবি। কী দেখল, শুনল, হুঁস ছিল না সুসানের। সমুদ্রের ঢেউ, নারকেল গাছের মাথা-দোলান মোসাহেবি, অতিকায় পশুদের গর্জন আর আরণ্য মানুষের কামনার দশ হাজার ফুট জোড়া বিস্তৃতির মধ্যে চেতনা ঝিমিয়ে এসেছিল। কে এই শ্বেতাঙ্গিনী, কেনই বা এই দ্বীপে, কেন তাকে নিয়ে এত কাড়াকাড়ি, কিছুই বুঝল না। সমস্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে এটুকু বুঝতে পারছিল সে সিনেমায় এসেছে, পাশে স্যামুয়েল, যার কঠিন, অধীর, দুঃসাহসী অঙ্গুলিসঞ্চালনে সুসানের শরীর পরিচয়ের স্পষ্ট আগ্রহ।

বাইরে যখন এল, তখনো রোদ মরেনি। স্যামুয়েল ওকে কিছু খেতে অনুরোধ করল। মাথা ধরেছিল, তবু সুসানের নিস্তেজ গলায় 'না' বলতে পারার ক্ষমতাও অবশিষ্ট ছিল না।

ঠাণ্ডা ঘর, ছোট ছোট টেবিল, জোড়া জোড়া চেয়ার। এককোণে বিলিয়ার্ডের টেবিল। কয়েকটা লোক সবুজ মখমল প্রচ্ছদের ওপর শাদা আর লাল বল চক-মাখানো কাঠি দিয়ে নিবিষ্ট করছে।

—ড্রিঙ্কস? স্যামুয়েলের প্রশ্নে চেতনা ফিরে এল।

—না, না, না।

সুসান কিছু বললে না। স্যামুয়েল অগত্যা ওর জন্তে খাম্ভ ফরমাস করল, নিজের জন্তে পানীয়।

চার কিস্তি খতম করে স্যামুয়েল আর একবার সুসানকে অনুরোধ করল। হ্যাভ এ সিপ,—এ ড্রপ? জাস্ট এ ড্রপ, ইউ নো, ওণ্ট হার্ম বাট পিক ইউ আপ।

বাজার সেরে বাসার সিঁড়ির মুখে যখন পৌছল, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। স্যামুয়েলের চোখ দু'টি ইতিমধ্যেই রক্তিম, বিস্ফারিত। কানের কাছাকাছি মুখ নামিয়ে বললে, এমিলি, পুওর গার্ল, আজও ওর নাইট ডিউটি। নো নো, নট্ দ্যাট আই মীন্ এনিথিং, শুধু খবরটা তোমায় দিলুম।

এমিলি কি কিছু বুঝতে পেরেছিল। মনে তো হয় না। তার পরে আরো তো দু'দিন স্যামুয়েলের সঙ্গে সুসান সিনেমায় গেছে। একদিন মোটর সাইকেলের পিছনে বসে ডায়মণ্ড হারবার। জীবন এমন থ্রিলিং সুসান জানত না। চাকার নীচে পথ নিশ্চিহ্ন, চুলের ড্রেস কখন বিলুপ্ত হাওয়ায়, শুধু একটি মাত্র উদ্দাম গতি, একটি মাত্র পরমথরথর আলিঙ্গন।

এমিলি মেয়েটা স্যামের যোগ্য হয়নি, মা একদিন বললেন।

—কী করে জানলে, মা।

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে মা বললেন, এ-সব কথা জানা যায় না, বুঝতে হয়। আহা, স্যাম বেচারা।

—কিন্তু মা, সুসান বললে, স্যাম তো ওকে দেখে পছন্দ করেই বিয়ে করেছিল।

—বোকার মত কথা বোলো না, মা ধমক দিলেন, ও-বয়সে কেউ কাউকে দেখে পছন্দ করে না, দেখা হলেই পছন্দ হয়। আমার তো মনে হয়, স্থাম বিয়ের শিকল কাটবার মতলবে আছে! আই ওণ্ট বি সারপ্রাইজড্ টু সি হিম ব্রেক উইথ হার সাম ডে।

স্থসানের কান দু'টি অলক্ষ্যেই লাল হ'ল! কে জানে, মার কথাটার লক্ষ্য কোথায়। স্থসান নিজেই কি জানে না, স্থামুয়েল কাকে চায়, বিয়ের পিঞ্জরে বন্দী বিহঙ্গ কোন্ আকাশের নীল দেখে ব্যাকুল হয়েছে।

সেই বছর ফেব্রুয়ারী মাসে স্থাম্‌দের ঘরে অতিথি এল। মিস পলা মিসকিথ। কার্শিয়াং হাসপাতালের সিসটার। সাজগোজ করত একুশের মত, দেখাত যেন চব্বিশ, আসলে ওর বয়স কোন না ছত্রিশ হয়েছে। পলাকে স্থসানের ভাল লাগেনি মোটে। সব সময় ভুরু তুলেই থাকত। আশে পাশে সব কিছু যেন তার অযোগ্য এমনি ভঙ্গিতে বইয়ে মুখঢাকা দিয়ে রাখত। পাহাড়ে থাকার অভ্যাস হয়ত। সব-কিছুই চোখে নীচু ঠেকে।

স্থামুয়েল আলাপ করিয়ে দিল:

—মিস মিসকিথ, আমার কাজিন। বেড়াতে এসেছেন। মিস ওয়েক, আমাদের প্রতিবেশিনী। পরিবারের বান্ধবী।

—ও। বই নামিয়ে রেখে পলা বললে,—কেমন আছেন।

স্থসান তার জবাবেও যদিচ জিজ্ঞাসা করল কেমন আছেন, আসলে সে ইতিমধ্যে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। এ মেয়েটি এমিলির মত নয়, যে আপনাকে নিয়েই বিভোর; খেয়ে খেলে ডিউটি দিয়েই খুশি। পলা

মেয়েটির বাইরে কোন উত্তাপ নেই, চাপল্য নেই, বরফচোখে চায়, যেন সব দেখে নেবে, বুঝে নেবে।

পলা একবার শুধু জিজ্ঞাসা করল, আপনার কাছে কোন বই আছে? আমার স্টক ফুরিয়ে যাবে তু'দিনেই।

সুসান বললে, বই তো নেই। —এ্যাম নট মাচ অব এ স্কলার।

তাই নাকি। পলা যেন করুণার চোখে তাকালে।

—কিছু জার্নাল আছে, চান তো দিতে পারি।

—জার্নাল? ঠাণ্ডা, কৌতূহলী দৃষ্টি পলার। বললে,—কী নাম, শুনি?

সুসান কয়েকটা নাম বলতেই হাঁসের মতো কাঁধঝাড়া দিয়ে পলা বললে, ও দোজ র‍্যাগস! প্রিণ্টেড ফিলথ, ছ্যাটস হোয়াট আই উড্ কল দেম। ও সব চাইনে। নো, থ্যাঙ্কস। বলেই আবার বইয়ে ডুব দিলে।

সুসান বলতে চাইলে, কলকাতা এসেছেন, তু'দিন একটু বেড়ান, বই-ই পড়বেন যদি, এখানে এলেন কেন। কিন্তু স্যামুয়েলের চোখের ইশারায় চুপ করে আস্তে আস্তে সরে এল।

তারপর যে-কদিন পলা ছিল, সুসান ওদের ঘরে বেশি যায় নি। পলার চোখের সমুখে কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। মনে হয়েছে, একে ফাঁকি দেবার যো নেই, সবার চোখ ঘুমোয়, পলার না।

পলা যেদিন চলে গেল তার পরদিনই স্যামুয়েলের সঙ্গে সুসান একটা ডগ্-শো দেখতে গেল। অভিমানাহত গলায় বললে, তোমার কাজিন চলে গেছে স্যাম?

—কাজিন? পলার কথা বলছ?

—হ্যাঁ।

—এ ক'দিন তোমাকে তো আর পাওয়াই যায় নি।

—তুমিই বা এসেছ কই, সু'। স্যাম ওর হাতে একটা চাপ দিলে।

স্যামের কনুইয়ের মধ্যে দিয়ে হাত চালিয়ে দিয়ে সুসান বললে, আমার ভয় করত। ওর চাউনি যেন কেমন কেমন, এমিলিকে ভয় পাই না, কিন্তু মিস মিসকিথ্,—

এই কুকুর-খুপ্‌রি থেকে ও-খুপ্‌রি ঘোরাঘুরি সারা হতে সুসান হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা স্যাম—

—কী।

—তোমার কী মনে হয়,—এমিলি পথ ছেড়ে দেবে? আমরা দু'জনে বরাবরের মত একসঙ্গে থাকতে পারব?

—দেবে। স্যামুয়েল বললে, তুমি কিছু ভেবো না। আমি সব ঠিক করব।

আরামের নিঃশ্বাস ফেললে সুসান, এতদিনে স্পষ্ট একটা কথা পাওয়া গেছে। বুক থেকে বোঝা নেমেছে। নীচু গলায় বললে, তুমি কিছু মনে কোরো না। মা জিজ্ঞাসা করছিলেন কি না,—এভাবে আর কতকাল —তাই। নইলে এতেই কি আমি কম সুখী।

প্রত্যুত্তরে স্যামুয়েলের মুখটা আনত হয়ে এল।

এটুকু মনে আছে পলা চলে যাবার পর থেকেই স্যামুয়েল যেন ওকে আরো বেশি করে ভালবাসতে শুরু করে দিলে। আগে তবু আব্রু ছিল, সময়-অসময় ছিল, এখন কাকস্য পরোয়া। সিনেমা থেকে খানা-ঘর, খানা থেকে নাইট ক্লাব, এরই ফাঁকে ফাঁকে আবার আছে ট্রাঙ্ক রোডে

দূরপাল্লার ড্রাইভ, সুইমিং ক্লাবে ডাইভ, এতদিন যেন মহলা চলছিল, এবারে প্রকাশ্য অভিনয়।

সেদিন শনিবার রেস থেকে ফেরবার পথে স্যামুয়েল ওকে কতগুলো ছবি দেখালে, ওদের দু'জনের, একসঙ্গে তোলা। কয়েকটা সাঁতারের স্বল্পবাসে, কয়েকটা নৈশ ক্লাবের স্বচ্ছাভাসে : পা ছাড়িয়েও অনেকদূর নেমেছে সে পোশাক, কিন্তু শুরু হয়েছে কাঁধেরও অনেক নীচে।

—প্রিন্টগুলো আজ পেলাম। স্যামুয়েল বললে।

—লুকিয়ে এগুলো তোলা হয়েছে, দুষ্টু কোথাকার—আমি টের পাইনি তো।

প্রত্যুত্তরে স্যামুয়েল শুধু হাসল।

তারপর সেই ছবিটা। চোখে পড়তেই সুসান আরক্ত হয়ে উঠল। সেই মুহূর্তটিতেও লজ্জা ছিল, কিন্তু এত বুঝি না। আজ সেই ছবি চেয়ে দেখতেও কী সঙ্কোচ। সেই হোটেলটা। চেনা করিডর—চেনা কামরা, নম্বরটাও ঠিক উঠেছে,—৩৫ এফ। কামরার ভিতরে নির্ভুল ভাবে চেনা যায় তা'কে আর স্যামকে। দরজা তো ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, কিন্তু খোলা জানালার বাইরে থেকেই কে যেন ছবি তুলে নিয়েছে।

ছবিটা স্যামুয়েলের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সুসান মুখ ঢেকে বসল। দু'জনের একসঙ্গে তোলা ছবি, কিন্তু একসঙ্গে দেখা যায় না, কী বিড়ম্বনা।

অনেকক্ষণ পরে সুসান বললে, আমার একটা কথা ভেবে ভারি অবাক লাগে, এমিলি কি কিছুই বুঝছে না। সব তো প্রায় ওর চোখের ওপরই ঘটছে। মা কিছু বলছেন না, তার কারণ জানি, কিন্তু এমিলির কথা তো আলাদা।

—এবার এমিলিও বলবে। নীচু, বিচিত্র গলায় জবাব দিলে স্যামুয়েল। —ও নিশ্চয়ই এর পরেও আমার সঙ্গে থাকতে রাজি হবে না।

দুরন্তগতি জীপে স্যামুয়েলের অঙ্গসংলগ্ন হয়ে বসেছিল সুসান। কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল।—ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়। বাট্ আই গ্যেস এ্যাট টাইমস ওয়ান মাস্ট বি সেলফিশ। তুমি ওকে খোলাখুলি সব বলো। এ ভারি বিশ্রী। লুকোচুরি নয়, কেননা কিছুই লুকোন নেই, তবু চুরি। —এত কথা সুসান কখনো গুছিয়ে বলতে পারবে ভাবেনি, —আমি শুধু তোমাকেই চাই না স্যাম ; বিয়ে করে সুখীও হতে চাই।

গাড়ির গতি কমিয়ে স্যাম ওকে ধীরে ধীরে বেষ্টন করলে। সুখী তুমি হবে ; এ নিয়ে এত ভাবছ কেন সু'। অনর্গল গলায় স্যাম সুসানকে ওর প্ল্যান বললে : বিয়ের পর কলকাতা পুলিশের এই চাকরি ছেড়ে দেবে,— অনেক দূর যাবে ওরা, সম্ভব হয় তো ইউরোপে।

ইউরোপ। স্বপ্নের দেশ ইউরোপ। সুসানের চোখেব মণি জ্বলে উঠল।

—সেখানে আমি চাকরি করব। দরকার হয়, তো, তুমিও।

—আমিও ?

—তুমিও। কত রকমের কাজ আছে সে সব দেশে। সে-কি এদেশের মত শুধু টেলিফোন অপারেটার আর টাইপীস্টের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ! দোকানে দোকানে ঝলমল পোশাকে ঘুরে বেড়াবে।

এমিলি চটে যাবে সুসান বরাবরই আশঙ্কা করেছে, কিন্তু সে যে এমনতর কেলেঙ্কারি করবে, ভাবতে পারেনি।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই দরজার ওপর ক্রুদ্ধ করাঘাত শুনেই অনুমান করতে পেরেছিল কে এসেছে। দরজা খুলে দিতেই এমিলি যেন হিংস্র বিড়ালীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। আধখানা গালে রুজমাখা, পাউডার বুলোয়নি, রাত-জাগা চোখ দু'টি টকটকে। এমিলি প্রসাধনও করেনি।

হাতের ফোটোটা ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে স্খলিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ব্যাপার তবে এতদুব গড়িয়েছে—দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ্ বিন আপ-টু। তারপর অনর্গল যে অশ্লীল অশ্রাব্য বিশেষণগুলো ব্যবহার করল এমিলি, তার তুলনা নেই। সুসান মাথা নীচু কবে দাঁডিযেছিল, মা এগিয়ে এলেন বাঁচাতে। এমিলিব ঝাঁঝ পডল না তবু। খালি হাঁপায় আর বলে, সো দিস হ্যাড্ বীন দ্য গেম অব ইউ টু,—ও দিস ইজ মিন, মিন, মিন। ইউ থিঙ্ক আই উইল টেক ইট লাইং ডাউন? নো ড্যামড্ ফীযার। আই উইল স্যু হিম,—উইল স্যু ইউ—বোথ্ অব ইউ।

ঝড়ের মত বেরিযে গেল এমিলি। আব মা মুখে রুমাল চাপা দিযে হাসতে লাগলেন। এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখলেন সুসানেব : ওর কথায় কান দিসনি। ঈশ্বব সহায়, অল্'স ওয়ার্কিং টু প্ল্যান। লীগ্যাল প্রসিডিংসের হাঙ্গামা চুকে যাক, তারপর আমিই তোদের দু'জনকে একসঙ্গে গীর্জায় নিয়ে যাব।

সেদিন থেকে এমিলি আর এ বাসায় থাকেনি। কয়েকদিনের মধ্যেই খবর এল এমিলি বিবাহ-বিচ্ছেদের নালিশ করেছে। বিবাদী স্যামুয়েল, সুসান সহ-বিবাদী। মিস্বিহেভিয়াবেব প্রমাণ আছে ছবি। হোটেলেব ম্যানেজারও সাক্ষী দেবে।

এই বুঝি সুসান চেয়েছিল, তবু যেন কাঁটার মত ফোটে। সুখী হবার এর চেয়ে কি ভদ্র কোন পথ ছিল না। এই আইন-আদালত, ঢাকপেটানো

কেলেঙ্কারী……। আর সেই ছবিটা। ওটা তো আদালতে সবাই দেখবে। ছিঃ।

তারপর একদিন মামলাও শেষ হ'ল। আদালত ভাঙতে সুসান বাইবে এসে শ্যামুয়েলের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এত লোকেব ভীড়ে শ্যাম কোথায়। লোকগুলো এমন অসভ্যেব মত ঝুঁকে পড়ে পড়ে তাকায়! সুসান বিব্রত বোধ কবল।

হয়ত দেখতে পায়নি ভেবে সুসান তাডাতাডি বাড়ি ফিবে এল। মা বসে আছেন একা।

—শ্যাম কি ফিরে এসেছে মা? অধীব কণ্ঠে সুসান জিজ্ঞাসা কবল।

প্রত্যুত্তরে মা ওব হাতে একটা চিঠি আব একটা চেক তুলে দিলেন। চেকটা চারশো টাকার, নীচে সই, শ্যামুয়েল ম্যাথুস।—ব্যাপাব কী মা? সুসান প্রশ্ন করল।

চিঠিটা পড। মা সংক্ষেপে বললেন।

শ্যামুয়েলেব লেখা চিঠি। মাকে। মিসেস ওয়েকেব কাছে প্রণাম শতকোটি পূর্বক শ্যামুযেলেব নিবেদন এই যে আজকেই বিকেলের গাডিতে ওকে দার্জিলিং যেতে হচ্ছে, বিনা নোটিশে কর্তৃপক্ষ হঠাৎ বদলি কবলেন। যাবার আগে দেখা কবা সম্ভব হ'ল না বলে শ্যামুয়েল যৎপবোনাস্তি লজ্জিত।

যাই হোক শ্যামুয়েলকে একটা অবাঞ্ছনীয় বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি দেবাব ব্যাপাবে মিসেস ওযেক ও তাঁব মেয়ে যা করেছেন শ্যামুয়েল তা কখনও ভুলবে না, এবং তার ভাবী পত্নী, কল্যাণীয়া পলা মিসকিথ, সাবা জীবন নিশ্চয়ই

সেটা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন। বিয়ে পলার কর্মস্থল কার্শিয়াংয়েই শুভ এপ্রিল মাসে শুক্লপক্ষে মহেন্দ্রলগ্নে হবে বলে স্থির হয়েছে। মিসেস ওয়েককে নিমন্ত্রণ করত স্যামুয়েল, কিন্তু তাঁর বয়স আর শরীরের কথা ভেবে বিরত হল।

সুসানের কাছে স্যামুয়েল বিশেষভাবে লজ্জিত। মিসেস ওয়েক তাকে যেন বুঝিয়ে বলেন পলার সঙ্গে তার বিয়ে অনেকদিন থেকেই ঠিক ছিল,—এমিলির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে থেকেই। মাঝখানে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়, যার জন্যে এমিলির সঙ্গে স্যামুয়েলের শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে যায়, আর সেই বিয়ে যে ওয়ার্ক করেনি, মিসেস ওয়েকের চেয়ে একথা কে ভাল জানে। সে বাধা যখন এতদিনে দূর হল, তখন পলাকে—যে এতকাল ধরে প্রতীক্ষা করে আছে—ভুলসংশোধনের সুযোগ না দিলে অধর্ম হ'ত। মিসেস ওয়েকের বিবেচনা আছে, তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন।

অবশ্য সুসান হয়ত মনে করতে পারে তাকে ঠকান হয়েছে। কিন্তু সব অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে, সব প্রতারণার ক্ষতিপূরণ। সংলগ্ন চারশো টাকার চেকটা তারই সেলামি। আর, জীবনব্যাপী অনুতাপ দিয়ে স্যামুয়েল তো ক্ষতিপূরণ করবেই।

সুসানের উপকার অবশ্য অবিস্মরণীয়। পলা যা অহঙ্কারী মেয়ে, সে যে কখনো বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় সহ-বিবাদিনী হতে রাজি হ'ত না, তাতে সন্দেহ নেই।

লেখাগুলো ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। ম্রিয়মান পড়ন্ত বেলার আলোয় আর পড়া যায় না। সুসান চিঠিটা মুড়ে রেখে দিল।

মা ইতিমধ্যেই চা তৈরি করে নিয়ে এসেছেন। সুসান বিছানায় মুখ লুকিয়ে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ। মাথা তুলল যখন, মিসেস ওয়েক দেখলেন, মেয়ের মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে।

ঠিক সেই সময়েই দরজায় টোকা পড়তে দু'জনেই চমকে উঠল। এমন অসময়ে আবার কে। সুসানের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল, স্যামুয়েল আবার ফিরে আসেনি তো। হয়ত গাড়ি পায়নি; কিংবা হয়ত সবটাই মিথ্যে, একটা প্রচণ্ড রকমেব ঠাট্টা করেছে স্যামুয়েল।

বাইরের বারান্দায় মা নীচু গলায় আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলছেন, সুসান অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। কে এসেছে। কী এত কথা।

কয়েক মিনিট পরে মা ফিরে এলেন।

—কে এসেছিল মা?

—সেকথা তোমার এখন শুনে কাজ নেই।

প্রায় ক্ষিপ্তের মত চেঁচিয়ে উঠল সুসান: আছে, আছে, আছে। আমি সব শুনব। বলো কে এসেছিল, কী বলে গেল।

—এসেছিল সেই হোটেলের ম্যানেজার।

—কোন্ হোটেলের?

—সেই, সেই যেখান থেকে ফোটাটা উঠেছিল, মা সঙ্কোচের স্বরে বললেন। তারপর তুই আর শুনে কী করবি,—বলে গেল ওদের হোটেলে এরকম কেস প্রায়ই আসে, যারা মিসবিহেভিয়ার প্রমাণের পার্টনার চায়। একটা সন্ধ্যা, কি একটা রাত······বুঝিস-ই তো। হোটেলের ম্যানেজারের

তোকে বেশ পছন্দ হয়েছে, বললে, ইয়োর গার্ল প্লেড্ হার পার্ট কোয়াইট ওয়েল—এই রকম একটি মেয়েই খুঁজছে ওরা। তোর সঙ্গে একটা কনট্রাক্ট করতে চায়। অবিশ্যি এব জন্যে ভাল টাকাও দেবে।

সুসানেব মুখেব দিকে তাকিয়ে মা চুপ করে গেলেন। একঠায় বসে আছে সুসান। মুখে একফোঁটা রক্ত নেই, পলক পড়ছে না চোখের।

কী ভেবে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে মিসেস ওয়েক মেয়ের কাছে এগিয়ে এলেন। সম্পূর্ণ গ্লাস নিঃশেষ কবে সুসান একটু হাসল।—আর তুমি কী জবাব দিলে?

—আমি না বলে দিয়েছি। তোব মনেব এই অবস্থা। বলে দিলুম তুই বাজি হবি না। আব প্রফেসনটার ডিগনিটি আছে কিনা তাও তো দেখতে হবে।

না বলে দিয়েছ? প্রফেসনের ডিগ্‌নিটি? সুসান হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল, হাতের মুঠিতে চেকটাকে পিষে ফেলতে ফেলতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, তোমাব কী মাথা খাবাপ হয়ে গেছে মা! কী বলে না কবে দিলে? এই চারশো টাকা কি ফুরোবে না ভেবেছ। তখন? না, না, মা, তুমি কালই যাও, সব কথা পাকা কবে এস।

—তুই রাজী আছিস? মিসেস ওয়েক স্তম্ভিত গলায় বললেন।

—রাজি না হয়ে উপায় কি। ক্লান্ত অবসন্ন মাথা চেয়ারেব পিঠে এলিয়ে দিল সুসান। ক্ষীণকণ্ঠে বললে, এখন থেকে আরও নিখুঁৎ পার্ট কবব, দেখো। এবাবে আর ভুল হবে না।

স্বয়ম্বরা

এক

জিওগ্রাফির বইয়ের পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ল ভাঁজ-করা এক টুকরো নীল কাগজ, যার শিরোনামায় লীলার নাম। সারা শরীর জ্বলে গেল, কান দু'টো গরম হয়ে উঠল লীলার। অনুপমের চিঠি, সন্দেহ নেই। এই নিয়ে বুঝি তিনবার হল। লোকটার স্পর্ধাও তো কম নয়।

আড়-চোখে লীলা একবার তাকিয়ে দেখল, রুবি দেখেছে কি না। রুবি তখন ভূগোলের অঙ্কে ডুবে গেছে। গ্রীনউইচ শূন্য আর কলকাতা প্রায় নব্বুই। গ্রীনউইচে যখন সকাল সাতটা, কলকাতায় তখন ক'টা, লীলাদি ?

কেন, তুমি বার করতে পারছ না। লীলা অঙ্কটা ছাত্রীকে আরেক বার বুঝিয়ে দিলে। কিন্তু বোঝাতে গিয়েও ভুল হয়ে যায়, একটা অস্বস্তি কাঁটার মত মনে বিঁধে আছে। চিঠিটা বাঁ হাতের মুঠোতেই রইল। ব্যাগ খুলে রাখবে সে উপায়ও নেই। রুবি ড্যাবডেবে বোকা চোখে তাকিয়ে আছে। চিঠিটা অবশ্য না পড়েও ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া চলে। লীলা জানে ওতে কী লেখা আছে। দু'-চার ছত্র কবিতা, তাও আবার ভুল কোটেশন। একটা-দু'টো বানান ভুল। আর, "তুমি-আমার-ঘুম-কেড়ে-নিয়েছ" জাতীয় খানিকটা অজ-বিলাপ। অবশ্য অজ শব্দটার অভিধানগত অর্থে। এ সব ন্যাকামি তো লীলা কম দেখল না—প্রথম প্রথম মজা পেত, এখন শুধু গা জ্বলে।

দরজার বাইরে পর্দার নীচে দু'খানি পা তখন থেকে ঘুর-ঘুর করছে। খুক্-খুক্ কাশি—ঠিক শ্লেষ্মাজনিত নয়—শোনা যাচ্ছে। লোকটা কী ভীরু। মেরুদণ্ড বলে কিছু ওর নেই না কি! সাহস থাকে তো আসুক না। এসে বসুক। এটা তো ওর দিদির বাড়ি। ভাগ্নীকে পড়ানোয় লীলা ফাঁকি দিচ্ছে কি না সেটা লক্ষ্য করবার অধিকার তো ওর আছেই।

আর যেমন চরিত্র তেমনি চেহারা। রোগা টিঙ্‌টিঙ্ করছে, ধাক্কা দিলে বুঝি পড়ে যাবে। নির্ঘাৎ ডিসপেপসিয়ায় ভুগছে। নিষ্প্রভ চোখ দু'টির নির্বুদ্ধিতা উঁচু পাওআরের লেনস্ দিয়েও ঢাকতে পারেনি। কথা বলতে এলেই কুঁজো হয়ে যায়, যেন কুর্নিশ করছে; কপালের রগটা মাঝে-মাঝে চেপে ধরে, যেন স্বাস্থ্যহীনতাই বাহাদুরি। এই মূঢ়কে কে বোঝাবে দুর্বলতার অভিনয় করে বড় জোর অনুকম্পা কুড়োন চলে, কিন্তু ভালবাসা কেড়ে নিতে হলে চাই সাহস আর বলিষ্ঠতা,—শরীরের এবং চরিত্রের। আধো-আধো বুলি শুনলে মনে একমাত্র মাতৃভাব আসে, তার বেশী কিছু না।

পড়ান শেষ হল। ব্যাগটা গুছিয়ে লীলা উঠে দাঁড়াল। নীচু হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলে শাড়ির ড্রেসটা ঠিক আছে কি না। তার পর বারান্দায় বেরিয়ে এল। এদিক্-ওদিক্ একবাব তাকালে কৌতূহল বশেই; তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলে। শেষ ধাপ অবধি পৌঁচেছে, এমন সময় পিছনে খুক্-খুক্ কাশির শব্দ শোনা গেল।

ভ্রূক্ষেপ না কবে এগিয়ে যাচ্ছিল, এবার মিহি-মার্জিত গলা কানে এল, 'শুনছেন।'

ঘুরে দাঁড়াল লীলা।—'কী বলুন।'

বেশী দূর নামতে সাহস করেনি অনুপম, গোটা-পাঁচেক ধাপ ওপরে, সিঁড়িটা যেখানে ঠেকেছে, সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কী রোগা আর হলদে! এক ফোঁটা মাংস নেই, এক ফোঁটা নেই রক্ত। একটু কাঁপছেও বুঝি নার্ভাস হয়ে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

—'আমার ইয়ে, আমার চিঠিটা পেয়েছেন ?'

—'পেয়েছি।' লীলা হেসে ফেলল রকম-সকম দেখে, মাস্টারনী মুখোসটা আর বজায় রইল না।—'কিন্তু জিওগ্রাফির বই তো ডাকবাক্স নয়।'

প্রশ্রয় পাওয়া জীব-বিশেষের মত অনুপম কোঁচা দোলাতে দোলাতে নেমে এল আরো তিন-চার ধাপ। মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে মিঠি-মিঠি হেসে বললে, 'সব ডাকই কি ডাকবাক্সের মারফৎ পৌছয়, না পাঠান চলে ?'

লীলার মুখে একটা কঠিন কথা এসেছিল: 'প্রেমের শখ আছে অথচ হাতে চিঠি দেবার সাহস নেই ?'—বলবে ভেবেছিল। কিন্তু কথাটাকে একটু কোমল করে বললে, 'হাতে দিতে পারেন না ?'

অনুপম হয়ত ভাবলে, এ-ও প্রশ্রয়। লীলা ওকে তবে উৎসাহ দিচ্ছে। যে দু'ধাপ বাকি ছিল, সে-দু'ধাপও নেমে এল। চকচকে গাল দু'টো। একটু আগেই কামিয়েছে বুঝি। বেহিসেবি স্নো মেখেছে। নির্মূল-শ্মশ্রু চোয়াল এখন আরো যেন তোবড়ান। লীলাকে ছুঁতে সাহস করলে না অনুপম, ধরা-ধরা গলায় শুধু বললে, 'অভয় দিচ্ছেন ?'

লীলা ধমক দিলে, 'সোজা হয়ে দাঁড়ান অনুপম বাবু। আপনার আগের চিঠি দু'টোও পেয়েছিলাম। কিন্তু তা নিয়ে কোন হৈ-চৈ করিনি এই জন্যে যে তা হলে এই ট্যুইশনিটা ছাড়তে হত। আজও করতাম না। কিন্তু আপনি ডাকাডাকি করেই সমস্ত অনর্থ ঘটালেন। গোটা কতক শক্ত কথা বলছি,

মনে কিছু করবেন না। আপনার গোড়াতেই ভুল হয়ে গেছে অনুপম বাবু।' —একটু থেমে, শান্ত ঠাণ্ডা গলায় লীলা ফের বলতে শুরু করল, 'আপনি দিদিব বাসায় পরম সুখে আছেন, খেয়ে, গড়িয়ে, সন্ধ্যায় বাঁশী বাজিয়েও হাতে বাড়তি যে সময়টুকু থাকে সেটুকু প্রেম করে কাটাতে চান। ভুলে যান যে আমার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গবীবের মেয়ে, কোন রকমে পাশ করেছি, দুপুরে ইস্কুলে চাকরি করি। এর ওপবেও যদি রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ি-বাড়ি পড়াতে যাই, সেটা প্রেম করতে নয়, প্রেমের কথা শুনতে নয়। সংসারে উপরি ক'টা টাকা আনতে। আমাব ওপর কতজনের ভার জানেন ? মা, বাবা, ছোট তিন বোন, নাবালক দু' ভাই। আমাকে ভালবাসেন বলছেন। পারবেন এদের ভার নিতে ?'

অনুপমেব গলা ক্ষীণতর হয়ে এল, 'একটা চাকরির কথা চলেছে, সেটা ঠিক হলেই—'

চিঠিখানা ওব হাতে ফিরিয়ে দিয়ে লীলা বললে, 'আগে ঠিক হোক, তাবপব এ-সব দেবেন। আরো একটা কথা আপনাকে বলি, এ-সব চিঠি-ফিটি দেবেন না। কিছু বলার থাকে সোজাসুজি এসে বলার সাহস অর্জন করুন। এই সব আশে-পাশে ঘুর-ঘুব করা, শুনিয়ে-শুনিয়ে গুন্-গুন্ করে গান গাওয়া, ন্যাকামি-ভর্তি কবিতা কোট্ করে চিঠি পাঠান, এ-সব ছাড়ুন। এতে মেয়েদের মন পাওয়া যায় না। পড়েন নি, বলহীনের কাছে কিছুই লভ্য নয় ?'

অনুপমের বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে লীলা বুঝি ঈষৎ করুণা বোধ করল। কিন্তু প্রয়োজন ছিল এই অপ্রিয় সত্য-ভাষণের। দুঃখ যদি পায় পা'ক্। একটা দুঃখেব ভেতব দিয়েও শিক্ষা হোক। এমন ভুল যেন আর না করে, পুরুষ না হয়েও স্ত্রীলোকের প্রণয়-প্রার্থনার মত ভুল।

রাস্তায় এসে লীলা দেখল এরি মধ্যে বেশ বেলা হয়েছে। যখন পড়াতে এসেছিল তখন সকালের চোর-রোদ পা টিপে-টিপে পাশের উঁচু বাড়িটার ছাদ থেকে এ বাড়ির ছাদে সবে লাফিয়ে পড়েছে। তারপর এতক্ষণ ধরে কেবল গড়িয়ে নেমেছে, আর ছড়িয়ে পড়েছে। জানালার পর্দায়, কম্পাউণ্ডের করবী আর কৃষ্ণচূড়ার পাতায়, শিশির-ভেজা ঘাসের শীষে শীষে। কব্জির ক্ষুদ্রাকৃতি ঘড়িতে সময় দেখল, সাড়ে আটটা। ইস্কুলের সময় প্রায় হয়ে এল। বাসায় ফিরে সবে পোশাকি জামা-কাপড় বদলাবার উপক্রম করছিল, মা বললেন, 'বাইরের ঘরে তোর জন্যে কে বসে আছে।'

আমার জন্যে? লীলা বিস্মিত হল। কে আবার এসেছে এত সকালে! অনুতপ্ত অনুপমই আবার আসেনি তো! কিন্তু এত শীগ্‌গির পৌছবেই বা কী করে। তেল মাখবে বলে খোঁপাটা খুলে ফেলেছিল, আবাব আলাদা করে চুলগুলো গ্রন্থিবদ্ধ করতে হল। কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই চিরুণী বুলিয়ে নিলে কপাল আর কানের কাছে।

বাইরের ঘরে এসে যাকে দেখল, তাতে মনে হ'ল এত সবের প্রয়োজন ছিল না। নিতান্তই এক জন ক্যানভাসার। এর আগেও দু'এক বার এসেছে লীলার কাছে। নিব্, কলম, পেন্সিল, চক, ব্লটিং আর কাগজের ব্যবসা করে লোকটা। তা ছাড়া ওর বুঝি নিজেরই কী একটা কালি আছে। লীলাদের ইস্কুলের কনট্রাক্টটা নেবে বলে ওকে এসে ধরেছে। লীলারই এক সহপাঠিনীর কি রকম আত্মীয় হয় বুঝি। প্রথম দিন তার কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছিল।

ডান হাতের কনুইটা টেবিলের ওপর, বাঁ হাতটা নীচে ঝোলান, লোকটাকে কুণ্ঠিত, জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে দেখে লীলার মায়া হল।

'নমস্কার।' লীলাকে ঢুকতে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়াল।

'নমস্কার।' গম্ভীর কণ্ঠে লীলা বললে মাস্টারনী-মানান গলায়, যেন চিনতে পারে নি এমন ভাব করলে।

'আমি মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্সকে রিপ্রেজেণ্ট করছি। স্মরজিৎ মিত্র।' ব্যাগ খুলে কার্ড বার করে দিলে লীলাকে। 'এর আগেও তো আমি এসেছি!'

কথা বলছে না তো খই ভাজছে, এই ক্যানভাসার জাতীয় লোক-গুলো এমন চালিয়াৎ হয়! করিস তো বাবা পেনসিল-কাঁচি-ছুরি ফিরি, অথচ পোশাকের ঘটা দেখে মনে হ'বে একটা প্রিন্স কিম্বা ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ম্যাগ্‌নেট হবে বুঝি। টুপি-ট্রাউজার-সার্ট-কোট-কলারের যোড়শোপচার আয়োজন আছে ঠিক।

লীলার অনুমতি নিয়ে লোকটা সিগারেট ধরালে একটা; আগুনটা ধরালে এক আশ্চর্য কৌশলে, শুধু মাত্র ডান হাতে। এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'নাউ টু বিজনেস। আমি ফেয়ার ফিল্ড চাই, ফেভার নয়। আমাদের স্টেশনারি জিনিশগুলোর স্যাম্‌পল আপনার কাছে দিয়ে যাই, বাজারের আর পাঁচটা জিনিশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। জানেন মিস্ সোম, আমি ডিজঅনেস্টিতে বিশ্বাস করি না। এই যে ফার্মটা গড়ে তুলেছি,—মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্স—এটা আমারি এণ্টারপ্রাইজে তৈরী। ক্যাপিটাল সামান্য যা-কিছু তাও আমার।'

একবার কইতে শুরু করলে থামতে চায় না। গলার স্বরও কী আশ্চর্য ভারি লোকটাব, অল্প-অল্প ঠাণ্ডা লাগলে যেমন হয়। কথা বলতে বলতে টেবিলে একটা চাপড় মেরেছিল, আস্তেই অবশ্য, তবু টেবিলটা

যেন এখনও থরথর করে কাঁপছে। কী মোটা-মোটা আঙুল,—বাহুমূল, কব্জি আর কনুইয়ের বেড়-এ বোধ হয় কোন তফাৎ নেই।

বেলা হয়ে যাচ্ছিল। লীলা বললে, 'আমাব বাসায় এসে তো স্থবিধে হবে না। এ-সব ব্যাপাব হেড্ মিস্ট্রেসের হাতে। ইস্কুলে আসবেন, ওঁব সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দেব।'

—'আশা দিচ্ছেন ?'

—'চেষ্টা করে দেখতে পাবি।' লীলা সংক্ষেপে বললে।

স্মবজিৎ মিত্র উঠে দাঁড়াল। কডকডে ইস্ত্রি, পুবো-হাতা সার্ট, বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছে ট্রাউজাবেব পকেটে। চকচকে নতুন পয়সাব মত তামাটে মুখ। স্বাস্থ্য এতটা উজ্জ্বল না হলে কালোই বলা যেত।

—'একদিন তবে আপনার স্কুলে যাচ্ছি।' শেষ বারেব মত মাথাটা নুইয়ে নমস্কার করে স্মবজিৎ চলে গেল। চৌকাঠ পেরিয়ে নামল বাস্তায়। তারপব ফিরে একবার বাডিটাকে দেখে নিয়ে আবার সোজা এগিয়ে গেল। লোকটা পা ফেলছে জোবে জোবে, দূবে দূবে। ওর চলায়-ফেবায় কথায, এমন কি উঠে দাঁডানোর ভঙ্গিতে, সিগাবেট ধরানোয, কোথায একটা অস্বাভাবিকতা আছে, চোখে সেটা বেঁধে, কিন্তু বোঝা যায় না, কেন ?

পবদিন সকালে যখন ছাত্রী পডাতে গেল, তখন লীলা ঈষৎ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। কালকেব সকালেব বিশ্রী ঘটনাটা ভুলতে পারেনি। অনুপম আজ আর চিঠি দিতে সাহস কববে না ঠিক, কিন্তু কে জানে হয়ত ওর দিদিকে কিছু বলে থাকবে। ও-সব প্যানপেনে

ছেলেদের অসাধ্য কিছু নেই। নিজের কীর্তি-কাহিনী চেপে গিয়ে হয়ত দিদিকে বলেছে, মাস্টারনী ওকে অবোধ মেষশিশু পেয়ে ঘাড় মটকানোর মতলবে ছিল ইত্যাদি। ছাত্রীর মাও কি ভাইয়ের কথা অবিশ্বাস করতে পারবেন, লীলাকে হয়ত ছাড়িয়ে দেবেন। নতুন টিচার আসবে রুবির জন্যে। আবার দিনকতক তাকেও চিঠি লেখালিখি করবে অনুপম (পুরনো চিঠিগুলোর নকল রেখে দিয়ে থাকে যদি, তা হলে তো কোন মেহনতই নেই), তারপর? হয়তো বা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। নতুন টিচারটা পটেও যেতে পারে বা। সিঁড়ির মুখেই দেখা হল অনুপমের সঙ্গে। মুখোমুখি পড়ে গিয়ে বুকটা একবার কেঁপে গেল লীলার, আজ আবার কি হয়, কে জানে। কিন্তু অনুপম ওকে দেখে গম্ভীর মুখে একপাশে সরে দাঁড়াল, কোন কথা বললে না। লীলা খানিকটা স্বস্তি পেল।

এর পরে রুবিও যখন রোজকার মত খাতা-পেন্‌সিল নিয়ে ঘরে ঢুকল, এমন কি রুবির মাও একবার ঘরে এসে স্মিত মুখে কুশল প্রশ্ন করে গেলেন, তখন আর সংশয়মাত্র রইল না যে অনুপম কিছু বলে নি।

এর পরে আরো দু’-তিন দিন অনুপমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আরো যেন হ’লদে হয়ে যাচ্ছে অনুপম, এ ক’দিনে চোয়াল যেন আরো চুপসে গেছে। ভেবেছিল, অনুপম ওকে কিছু বলবে; কিন্তু লক্ষ্য করল, ওকে দেখলেই অনুপম গম্ভীর মুখে সরে যায়, স্পষ্ট বোঝা যায়, এড়াতে চায়।

ক’দিন পরে অনুপমকে আর দেখতেই পেল না। এক দিন দু’দিন তিন দিন কেটে গেল। শেষে লীলাই একদিন কৌতূহলী হয়ে ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার মামাকে যে দেখছি নে?’

রুবি বললে, ‘ওমা, জানেন না বুঝি। মামা এখান থেকে চলে গেছে।’

—'চলে গেছে? কোথায়?'

—'কানপুরে। আমার এক মাসিমার কাছে। সেখানেই এক ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়েছে, শুনেছি।'

লীলা বললে, 'ও!'

জানালার বাইরে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্কও হয়ে গেল। নিছক চাকরির জন্যেই লোকটা কানপুর গেছে এ কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। আঘাতটা ভুলতেই গেছে। কেবলমাত্র তার জন্যেই একটা লোক দেশান্তরী হয়েছে, কথাটা ভেবে লীলার মন খাবাপ হয়ে গেল।

দুই

বিজনেস করছে অথচ লোকটার সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও নেই। এসেছে যখন শেষ ঘণ্টাটিও বেজে গেছে। চক-মাখা হাত ধুযে লীলা ছাতা আব বই হাতে নিয়ে তৈরি হয়েছে বাড়ি যাবে বলে, এমন সময় বেয়াবা নিয়ে এল ভিজিটিং কার্ড। এ কার্ড লীলাব ব্যাগেব মধ্যে আবো খান-দুই আছে। 'মিত্র অর্ডাব সাপ্লায়ার্স, রিপ্রেজেণ্টেড বাই এস. মিত্র।' পবিষ্কাব স্বাক্ষর করেছে: এম-আই-টি-আব-এ। ইঙ্গবঙ্গীয় মিটাব হয়নি, এই ঢেব।

নীচে নেমে এসে লীলা ধমকের স্বরে বললে, 'আচ্ছা, এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি ব্যবসা করবেন? আপনাকে কি এখন আসতে বলেছি? চারটে বেজে গেছে, হেড মিস্‌ট্রেস চলে গেছেন কখন—'

'তাতে কী হয়েছে?' ঈষৎ স্মিত, কতকটা অপ্রতিভ, মুখে স্মরজিৎ উঠে দাঁড়াল। 'আরেক দিন না হয় আসব।'

পাশাপাশি গেট অবধি এল ওরা। লীলা বললে, 'বিবেচনার অভাবে আজ আপনার শুধু পরিশ্রমই সার হল।'

'শুধু পরিশ্রমই নয়।' স্মরজিৎ একটু হেসে বললে, 'পারিশ্রমিকও কিছু তো পেলাম, পাইনি ?'

লীলা সামান্য চমকে উঠল। সহজ, স্বাভাবিক গলায় একেবারে সোজাসুজি কথা বলছে লোকটা। বাঁকা গলি-ঘুঁজি চেনে না। ট্রাউজারের পকেটে বাঁ হাত রেখে পাশাপাশি একেবারে সটান হেঁটে যাচ্ছে। কোথাও কুণ্ঠা নেই। সেদিনও মনে হয়েছিল, আজও মনে হল, লোকটার সপ্রতিভতা আছে, কিন্তু সেটা যেন অতিপ্রকট।

'আপনি কোন্‌দিকে যাবেন ?' জিজ্ঞাসা করলে স্মরজিৎ।

—'বাসায়। আপনি ?'

—'ঠিক নেই।'

লীলা বললে, 'আচ্ছা, তা হলে চলি।'

—'চলবেন ?' লোকটা এক মুহূর্ত যেন ইতস্তত করল, তার পর বললে, 'চলুন তবে। আমিও এদিকেই যাব।'

কিছু বলাও যায় না। রাস্তা তার একার নয়। তবু পাশাপাশি হেঁটে যেতে লীলা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল। ট্রামে-বাসেও এ সময় বড় ভীড়। একটা রিক্‌সা দেখে লীলা এক মুহূর্ত দাঁড়াল। কিন্তু স্মরজিৎও দাঁড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

—'রিক্‌সা করবেন ? উঠুন না। অনেকখানি তো পথ।'

—'না, না।' কুণ্ঠিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল লীলা, প্রায় চীৎকারের মত শোনাল, এক রিক্‌সায় ওঠার চেয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া ভাল।

খানিকটা গিয়ে স্মরজিৎ প্রস্তাব করল, 'একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক্, কি বলেন ? সেই কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন।'

একবার রিক্সায় ওঠার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, চা খেতে অস্বীকার করবার শক্তি লীলার ছিল না। এই লোকটার না-বুঝ আবদারের মধ্যেও কোথায় যেন একটা তুর্নিবার দাবী আছে, প্রশ্রয় না দিয়ে উপায় নেই। নিজে যেচে এসে আলাপ করেছে, পাশাপাশি চলেছে, একে ফেরাতে হলেও কিছু দিয়ে তবে ফেরাতে হয়।

চা খেতে-খেতে স্মরজিৎ ওর জীবনের কাহিনী শোনালে। চমকপ্রদ কিছু নয়। প্রায় সবটাই মামুলি। লেখা-পড়া বেশিদূর হয়নি। মা-বাবাকে ছোটবেলাই হারিয়েছে। মামা-বাড়ি থেকে কোন রকমে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। আর বেশিদূর পড়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবু কলকাতা পালিয়ে এসেছিল, এক বস্ত্রে, ছ' আনা সম্বল করে। পড়া-শুনার সুবিধে কিছু করতে পারে নি। কিন্তু ভাগ্যক্রমে চাকরি পেয়েছিল। আর সে কতরকমের চাকরি। মুদি-দোকানে,—শুধু খোরাকি আর তু' টাকা পেত। সেই থেকে এক দপ্তরীখানায়, দপ্তরীখানা থেকে বইয়ের দোকানে, বইয়ের দোকান থেকে—'

লীলার মুখের দিকে চেয়ে স্মরজিৎ বললে, 'থাক, এত কথা শোনবার আপনার ধৈর্য থাকবে না।' পকেট থেকে সিগারেট বার করে ফস্ করে ধরাল, এবং লীলা লক্ষ্য করল, সেই আশ্চর্য উপায়ে, ডান হাতে।

স্মরজিৎ ফের বলতে শুরু করলে, 'এটুকু শুধু জেনে রাখুন, দিন কতক এক রেলওয়ে লেভেল ক্রশিংএর গুমটি-ঘরেও কাজ করেছি—সেখানেই বাঁ হাতটা কাটা যায়।'

—'কাটা যায় ?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল লীলা।

—'কাটা যায়।' স্মরজিৎ কথাটার পুনরুক্তি করল। 'দেখছেন না, আমার বাঁ হাত নেই।' প্যাণ্টেব পকেট থেকে হাতটা বার করে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে টেবিলের ওপর রাখল স্মরজিৎ। কনুই থেকে কব্জি অবধি একখানা কাঠ শুধু, তারপর ইস্পাতের পাঁচটা আঙুল তীক্ষ্ণভাবে এগিয়ে এসে যেন দৃষ্টি বিদ্ধ করছে।

লীলা শিউবে উঠল একবাব, এবং সেটা স্মরজিতের কাছে গোপন বইল না।

—'ভয় পেলেন ?' আস্তিনটা আবার টেনে দিযে হাতটা পকেটে পুরে স্মবজিৎ জিজ্ঞাসা করলে।

লীলা অপ্রতিভ ভাবে বললে, 'না। তার পরে বলুন।'

এতক্ষণে বুঝি বোঝা যাচ্ছে লোকটাকে। এর একটা অঙ্গ নেই, সেইটে ঢাকতেই একটা স্মার্টনেসেব অভিনয করতে হয়, চট্‌পটে ভাব দেখাতে হয়। এমন যে স্বাস্থ্য, সার্টেব নিচে স্ফুরিত পেশীর ইঙ্গিত, সব কেমন মেকি মনে হল লীলার। ওব চোখ তু'টির তীব্র ঔজ্জ্বল্যেব নীচেও একটা দৈন্য লুকান, যা মুগ্ধও করে, করুণাও আনে।

রাস্তায় নেমে স্মবজিৎ বললে, 'এখনো আমার সংগ্রাম শেষ হয়নি। ভাল করে দাঁড়াতেই পারছি না। বাজার খারাপ। আমার স্টক কম, খুচ্‌রো কারবার, আমার কোটেশনও একটু চড়াই হয়, বড়-বড় ব্যবসাদারদের

মত কম মার্জিনে তো ছাড়তে পারি না। আব আমাদের দেশে দেশ-প্রীতি সব মুখে-মুখে, বিলিতি জিনিশ পেলে কেউ দেশী জিনিশ ছোঁয় না। তবে হাল ছাড়িনি। দমদমের ওদিকে ছোট একটা বাসা নিয়ে আছি। কালিটা আমাব নিজের। তা ছাড়া ছোট-খাটো দু'-একটা টয়লেটেব উপচারেব ফরমুলা নিয়ে নাড়া-চাড়া কবছি। এ থেকে বড একটা পারফিউমারি আমি গড়ে তুলবই। আপনারাও বইলেন, দেখবেন একটু-আধটু।'

লীলা প্রতিশ্রুতি দিলে, দেখবে।

ওরা বাসার কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। স্মবজিৎ বললে, 'চলি তাহ'লে, নমস্কাব। শীগ্গিরই একদিন আপনার ইস্কুলে যাব।'

—'নমস্কাব,' বললে লীলা। কিছুক্ষণ চেয়ে বইল পিছন ফিবে। সেই উদ্ধত চলবাব ভঙ্গি। পকেটে একটা হাত ঢোকালে। কিন্তু সে বকম বিসদৃশ বোধ হল না। একটা হাত নিযেই অদৃষ্টেব সঙ্গে যুঝছে লোকটা, ভাবতেও ভাল লাগল। আঘাত আছে, কিন্তু পবাজয নেই। ভিক্ষা নেই, তবু প্রাপ্য আদাযের প্রতিশ্রুতি আছে। আবাব দীঘ পদক্ষেপে শুধু দৃঢতাই নেই, একটু কাঁপা কাঁপা অসহায়তাও আছে যেন। হয় লোবটাকে ভ ল লাগবে না, ওব আলাপচাবিতাকে যেচে এসে ভাব করাব মত মনে হবে, নয় তো ওব সবটুকু ভাল লাগবে,—চলা-ফেরা-আলাপ, এমন কি প্যাণ্টেব পকেটে লুকান হাত নিয়ে অখণ্ড যে মানুষ, তাকে।

হেড মিস্ট্রেসকে আগেই বলে রেখেছিল, স্মবজিৎ নিজেও এর পব একদিন এসে আলাপ কবে গেল। কিছু কিছু জিনিশ হেড মিস্ট্রেস সেদিনই নিলেন, প্রায় কুড়ি টাকার মত। এ ছাড়া মাসে প্রায় টাকা পঞ্চাশের মত

জিনিশ নিতে পারবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সামনেই টার্মিন্যাল পরীক্ষা। সে জন্যে খাতার কাগজও চাই।

সেদিন খুব খুশি-খুশি দেখাল স্মরজিতকে। রাস্তায় এসে লীলাকে বললে, 'আমার সত্যি খুব উপকার করেছেন।'

কুণ্ঠিত হয়ে লীলা বললে, 'এ আর কী। এতে আপনার কতোই বা থাকবে।'

স্মরজিৎ বললে, 'দশ পার্সেণ্টের ওপর; তা ছাড়া কালিটা আমার, ওটাতে তো ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট। অবশ্য টাকার অঙ্কই শুধু নয়—'

আবার উচ্ছ্বাসের মুখে কী বলে বসে ঠিক নেই, লীলা তাড়াতাড়ি বললে, 'আর বেশি দূর যাব না, টিফিনের পর আমার আবার ক্লাশ আছে।'

—'এই পার্কটায় তবে একটু বসি চলুন।'

দুপুরের দিকে পার্কটা এমনিই নির্জন। এক কোণে কতগুলো লোক তাস খেলছে। চিনেবাদামওয়ালা ঝিমোচ্ছে এক কোণে, চাকরির জন্যে হাঁটাহাঁটি করে হয়রান দু'চার জন ছায়ার নীচে বেঞ্চের ওপর ঘুমিয়ে। যত্ন করে লাগান সীজন ফ্লাওয়ারগুলোও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, সকালে রোদ্দুর ওদের ফুটিয়েছিল, রোদ্দুরই এখন সব রস টেনে নিচ্ছে।

ঘাসের ওপর বসল দু'জনে। খানিকক্ষণ কোন কথা হল না। স্মরজিৎ একটু পরে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বাক্স বার করে বললে, 'হাত পাতুন।'

কঠিন হয়ে উঠছিল লীলার মুখ। বললে, 'এ আবার কী?'

—'খুলেই দেখুন না।'

স্পর্ধার সীমা নেই। কী উপহার এনেছে দেখ। ছোট্ট শিশিতে এসেন্স, একটা কৌটোয় স্নো কিম্বা ক্রীম হবে বুঝি। যেমন রুচি, তেমনি সাহস।

—'কিনে এনেছেন তো?'

স্মরজিৎ বললে, 'কিনে আনিনি। আমার নিজের হাতের তৈরি; সেদিন আপনাকে বলেছিলুম না ফরমূলার কথা? তাই থেকে এই হয়েছে। প্রথম তৈরি জিনিশ, আপনাকেই দিলাম দু'টো। কিছু অন্যায় হয়েছে?'

'অন্যায়?' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লীলার মুখ।—'আপনি নিজের হাতে তৈরি করেছেন, সত্যি?' কৌটো খুলে নাকের কাছে এনে প্রাণ ভরে টেনে নিলে গন্ধ।—'তবে এবার আপনার ফার্ম পুরোদস্তুর পারফিউমারি হয়ে গেল।'

—'হলই তো।' উৎসাহ পেয়ে স্মরজিতেরও মুখ খুলে গেল, 'অবিশ্যি বাজারে চালাতে এখনো কিছু বেগ পেতে হবে, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির খরচাও কম নয়। আপনি অবিশ্যি আপনার চেনা-শোনা, মেয়ে-মহলে বলে দিতে পারেন—'

—'পারবই তো।' বললে লীলা।

—'আমার আরো ইচ্ছে আছে,' স্মরজিৎ বলে গেল, 'একটা স্বগন্ধি তেলের ফরমূলাও পেয়েছি। এ ছাড়া পাউডার, আলতা, এমন কি শাবান পর্যন্ত···আমার স্বপ্নের কূল-কিনারা নেই লীলা দেবি!'

তার পর লীলার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'যাবেন একদিন আমার বাসায়, নিজে চোখে দেখে আসতে পারতেন সব; আমার ল্যাবরেটরি। সামান্যই আয়োজন, কিন্তু একটা বৃহৎ পরিণতির সূচনা দেখতে পেতেন।'

—'আপনার বাসায়' বিস্মিত, ভীরু-ভীরু গলায় লীলা জিজ্ঞাসা করল, 'আর কে আছেন?'—প্রশ্নটা নিজের কানেই অর্থহীন, অতি-সাবধানী, বোকা-বোকা শোনাল।

'আমার এক পিসীমা আছেন।' বললে স্মরজিৎ। তার পর লীলার মুখের দিকে চেয়ে ওর প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললে,—'ভয় নেই, স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত বাড়িতে আপনাকে নিয়ে যাবার নিমন্ত্রণ করব, এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন এখনও হইনি।'

লজ্জিত হয়ে লীলা বললে, 'সে জন্যে নয়, সে কথা ভেবে বলিনি। আমার আবার রবিবার ছাড়া ছুটি নেই কি না, অন্য দিন টিউশনি, তুপুরে স্কুল—'

—বেশ, তবে রবিবারেই যাবেন।' বললে স্মরজিৎ।

লীলা সম্মতি দিল, কিন্তু রবিবার মানে যে একেবারে পরের রবিবার, তখন বুঝতে পারেনি।

খেয়ে উঠে একটু গড়িয়ে নেবে ভেবেছিল, ঠিক এমন সময় স্মরজিৎ এসে হাজির।

—'চলুন।'

—'বাঃ রে, কোথায় ?'

—'মনে নেই ? আজ আমার ওখানে যাবেন কথা দিয়েছিলেন।'

—'দিয়েছিলাম বুঝি ? কি আশ্চর্য দেখুন', লীলা বললে, 'একেবারে মনে নেই। যেতেই হবে ?'

জিজ্ঞাসা করে স্মরজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল এ প্রশ্ন একেবারে নিরর্থক, যেতে হবেই, এসেছে যখন।

—'একটু বসুন, তৈরী হয়ে নিই।'

তৈরী হতে সেদিন সময় লীলার কিছু বেশিই লাগল। ঘণ্টা খানেক আগেই স্নান করেছে তবু আরেকবার শাবান দিয়ে মুখ ধুতে হ'ল। পোশাকের বাহুল্য কোনদিনই ছিল না, না ছিল শখ, না সামর্থ্য। আজ

মনে হ'ল, বাইরে বেরুবার উপযোগী জামা-কাপড আর দু'একটা বেশি থাকলে কিছু ক্ষতি হত না।

শ্যামবাজারে বাস বদল করতে হ'ল। পেরিয়ে গেল বেলগাছিয়ার পুল, তারপর যশোর রোড্। মসৃণ পথ। শহরতলীর এদিকটাতে লীলা কখনো আসেনি। কয়েকটা বড বড কারখানা পেরিয়ে এরোড্রোম, তারপর থেকেই গ্রামের ছোপ্ লাগল। রাস্তার দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিশু, শিরীষ, বট, অশথ। ক্বচিৎ কৃষ্ণচূড়া। ঝাউ আর দেবদারু। ঝাঁকড়া-চুল গ্রামীণের মত পলাশ। লাল আর সবুজ, মাঝখান দিয়ে পথ, গির্জার খিলানের মত। দু'ধারের মাঠের মাঝে-মাঝে অসম্পূর্ণ ইঁটের পাজা।

—'এসে গেছি। আসুন নামি।'

সুরজিতের কথায় চমক ভাঙল।

—'এখানেই ?'

—'আবার কত দূরে, বারাসত যেতে চান না কি ?'

যশোর রোড থেকে ছোট একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে মাঠের রাস্তা। 'আপনার হয়ত চলতে অসুবিধে হবে', সুরজিৎ বলল।

—'কিছু মাত্র না। আমার বেশ ভালই লাগছে।'

কানের পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ হাওয়া। প্রান্তরের একটা নিজস্ব সুর আছে, লীলা ভাবলে। এটা বুঝি নিয়ত প্রবহমান হাওয়া, যা কখনো ফুরোয় না। দূরের গাছগুলোর একটি পাতাও নড়ছে না, তবু কানের কাছে এই গুন্-গুন্ আসে কোথা থেকে।

খানিকটা এগোতেই আবার লোকালয় পড়ল। শহরের সঙ্গে এর তফাৎ সহজেই চোখে পড়ে। শহরের বাড়িগুলো একে অপরের সঙ্গে পাল্লা

দিয়ে উঠেছে, কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে। আব এখানে এক-একটি জায়গায় কতগুলো কুঁড়ে ঘব একসঙ্গে জড়ো-সড়ো হ'য়ে আছে, একে অপরের ওপব ভর করে। গাছেব ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার। নিজেব পায়ের শব্দে নিজেরই চমক লাগে। আম, জাম, আমলকী, কামবাঙ্গা আর জামরুল। পাতায় পাতায় পাখিব কলস্বব।

—'আমার বাসা। একটু দেখে আসবেন, বাঁশেব মাচাটা বড় দোলে।'

এতক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছিল, এবার লীলা ফিরে এল বাস্তবে। খান-তিনেক ছোট-বড ঘর। একটাব দাওযা পাকা, বাকি দু'টোই কাঁচা। জানালা বন্ধ থাকায় ঘরটা স্যাঁতসেঁতে লাগছিল, স্মরজিৎ খুলে দিল। তাব পর ডাকল, 'পিসীমা, পিসীমা।'

পিসীমা আসতেই লীলা খানিকটা ইতস্তত কবে প্রণামই কবল।

স্মবজিৎ বললে, 'আপনাবা গল্প করুন বসে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।'

পিসীমা বললেন, 'তোমার কথা আমি ওব কাছে অনেকবাব শুনেছি। তুমি ওব জন্য অনেক কবেছ।'

লীলা কুন্ঠিত হয়ে প্রতিবাদ করলে। স্মবজিৎ ফিবে এসে বললে, 'আসুন, আমাব ল্যাববেটাবি দেখবেন।'

গোটা-কতক কাচের নল, খালি শিশি আব ছোট-বড বোতলে মিলিয়ে ডজন কয়েক, এরই নাম স্মরজিৎ দিয়েছে ল্যাবরেটারি? মুহূর্তে লীলার সব উৎসাহ যেন নিবে গেল। একে ভিত্তি কবে উঠে দাঁড়ানর স্বপ্ন দুবাশা ছাড়া কী। চেয়ে দেখল, আশা-দীপ্ত চোখে স্মরজিৎ তার দিকেই তাকিয়ে। লজ্জিত হয়ে পড়ল লীলা। বললে, 'বাঃ, বেশ তো!'

আর অমনি খুশি হয়ে উঠল স্মরজিৎ। 'আপনি এনকারেজ করছেন?' অনর্গল কথা বলে গেল। দু'-একটা প্রিপেয়ারেশনের তাৎপর্যও বুঝিয়ে দিলে সংক্ষেপে। 'আপনার মনে হয় না এর পসিবলিটি প্রচুর। আরো যখন বড় হবে, তখন একটা কারখানা করব। সামনের এই জমি এবং জলাটা কিনে নেব।'

ভিজে মাটির গন্ধ লাগছে নাকে। শীতের বেলা গড়িয়ে এল। ঘরখানা অন্ধকার-প্রায়। একটা হাত ঘুরিয়ে স্মরজিৎ বিশদ ব্যাখা করছে, কাটা হাতটা অসতর্কভাবে ঝুলছে এখন। আর স্মরজিতের ভবিষ্যতের স্বপ্ন-দেখা চোখ দু'টো চুরুটের আগুনের মত জ্বলছে।

হঠাৎ কেমন শিউরে উঠল লীলা। শরীরটা ছম-ছম করে উঠল, বললে, 'চলুন যাই।'

—'এখুনি যাবেন?' স্মরজিৎ একটু যেন দমে গেল।

—'চলুন তবে।'

পিসীমা ইতিমধ্যে চা তৈরী করেছিলেন। খেয়ে আর লীলা বসল না। —'এস মাঝে-মাঝে।' পিসীমা এগিয়ে দিতে এসেছিলেন, তাঁর কণ্ঠে অনুনয়ের সঙ্গে কাতরতাও শোনা গেল, অন্তত তাই মনে হ'ল লীলার।

—'আসব,' লীলা বললে। যদিও সে ইতিমধ্যেই স্থির করেছিল, আর কোনদিন আসবে না। পিসীমার কণ্ঠের ব্যাকুল কাতরতা থেকে সহজেই অনুমান হয় স্মরজিতের আত্মীয়-বন্ধু বেশি নেই। নির্বান্ধব পুরীতে পিসীমা আছেন একলাই, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। লীলাই হয়ত এ-বাড়িতে প্রথম অতিথি।

তিন

সেদিন বাড়ি ফিরে পোশাক বদলাতে বদলাতে লীলা নিজেকে প্রশ্ন করেছিল, তার এই আকস্মিক আশাভঙ্গের হেতুটা কী। কী দেখবে বলে আশা করে গিয়েছিল, কী দেখতে পায়নি। সন্দেহ নেই, দূব থেকে স্মবজিতের বিচিত্র ব্যক্তিত্ব ওব মনে সামান্য একটু বঙীন অনুভূতি এনে দিয়েছিল, এই লোকটি অদৃষ্টের সঙ্গে এক হাতে পাঞ্জা কষছে—চিত্রটি সম্ভ্রম এনেছিল মনে, সেই সম্ভ্রম থেকে এসেছে কৌতূহল, যাকে খেয়ালও বলা যায়। কিন্তু কাছে এসে বিকলাঙ্গ জীবনের স্বরূপ দেখে বুঝি স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। দূব থেকে মনে হয়েছিল, ফিকে রঙীন, কাছে গিয়ে দেখল বক্তেব মত গাঢ লাল। সভয়ে পিছিয়ে এসেছে, পালিয়ে বেঁচেছে। খসে-খসে পডা মাটিব দেয়াল, স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটি, সমস্ত উঠোন ভরে হাঁস-মুর্গী পায়বাব যদৃচ্ছ বিচবণ। দূব থেকে বাহবা দেওয়া চলে, কাছে এসে অংশীদার হওয়া চলে না।

চা ঢালতে ঢালতে পিসীমা গল্প করছিলেন, ওঁকেও বেরুতে হয় স্মবজিতের তৈরী জিনিশ নিয়ে। 'বুড়ো মানুষ, পেরে উঠিনে। একটুকুতে হাঁপিয়ে পডি। আমাব কাছ থেকে কেউ জিনিষ কিনতেও চায় না—' আক্ষেপ কবে বলেছিলেন।

শুনতে শুনতে ঠোঁটেব কাছে চায়ের বাটি বিষিয়ে উঠেছিল। পিসীমা বুডো মানুষ, ক্যানভাসার হিসাবে অযোগ্য, তাই কি স্মরজিৎ ওকে এখানে এনেছে? ওকেও তার বণিক-বৃত্তির জোয়ালে জুতে দিতে চায় বুঝি, সন্দেহ এসেছিল মনে।

চলে আসবার আগেও স্মরজিৎ বলেছে, 'এখুনি যাবেন? বাড়ির পেছনে একটা পোলট্রি করেছি, দেখে যাবেন না?'

—'না।'

—'আর ছোট একটা বাগানও করেছি, এ থেকে পরে হয়ত নার্সারি চলতে পারে একটা। তবে একলা মানুষ', স্মরজিৎ হেসে বলেছিল, 'তাতে আবার একটা মোটে হাত, সব পেরে উঠিনে।'

'তাই বুঝি আমাকে এনেছেন', রূঢ় এই প্রশ্নটা এসেছিল জিহ্বাগ্রে, কিন্তু লীলা নিজেকে সংবরণ করেছে।

মনে-মনে স্থির করলে লীলা, আর কখনো দমদমে যাবে না। কী কাজ স্মরজিতের সঙ্গে এত মাথামাখির, কত দিনেরই বা চেনা! কালি, নিব, পেনসিল বিক্রি করতে এসেছিল, লীলার সাহায্য চেয়েছিল, সে সাহায্য তো লীলা যথাসাধ্য করেছে। এর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা মারাত্মক হবে। প্রথমত লীলা কাউকে বিয়েই করবে না,—মা-বাবা-ভাই-বোনের এই গোটা সংসারটার বোঝা তার ঘাড়ে। বিয়ে যদি কখনো করতেই হয়, তবে এমন কাউকে করবে, যে সঙ্গতিপন্ন, অন্তত এই সংসারটার দায়িত্বও নিতে পারবে। স্মরজিৎ নিজেই টলমল করছে—

চিন্তার রাশ টেনে দিলে লীলা। এ সব কথা ভাবছে কেন। স্মরজিৎ তো কখনো আভাসও দেয়নি। লীলার কাছে সহানুভূতি পেয়েছিল, হয়ত জীবনের প্রথম সহানুভূতি, তাই উৎসাহ নিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় গেছে, হয়ত আর কোন কথা স্মরজিৎ নিজেই ভাবেনি। আর এমন পাগলের দুরাশা কি স্মরজিতের হবে।

ঠিক দু'দিন পরে স্কুলে ঢোকবার সময় গেটের সমুখে স্মরজিৎকে

পায়চারি করতে দেখে লীলা জ্বলে উঠল। বাঁ হাতটা পকেটে, ডান হাতে ব্যাগ, ঠোঁটে সিগারেট, কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরছে দেখ। মেয়ে স্কুলের সামনে, কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে। নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি আছে।

—'আজ আবার এসেছেন কেন?' সামনে গিয়ে রূঢ় কণ্ঠেই লীলা জিজ্ঞাসা করল,—'আপনাকে তো হেড মিস্‌ট্রেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, আর কী চাই?'

বিস্ময়ে, অপমানে একেবারে শাদা হয়ে গেল স্মরজিতের মুখ। 'আর?' অস্ফুট, নীরস কণ্ঠে বলল, 'আর কিছু চাই না। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সেদিনকার পেমেণ্টটা এখনো কিছু বাকি আছে—'

আরো কী কী কঠিন কথা বলবে বলে লীলা স্থির করে রেখেছিল, কিন্তু পেমেণ্টের কথা শুনে যেন একটু চমকে গেল। পেমেণ্ট? শুধু টাকা চাইতেই লোকটা এসেছে নাকি। 'আসুন' বলে স্মরজিৎকে নিয়ে গেল একাউণ্টেণ্টের কাছে। লিখিয়ে দিল চেক।

চেকটা নিয়ে স্মরজিৎ আর দাঁড়াল না। শুষ্ক একটা নমস্কার মাত্র করে রাস্তায় গিয়ে নামল। একটু এগিয়ে স্টপেজের ধারে ট্রামের অপেক্ষা করতে লাগল। ট্রাম এল প্রায় বোঝাই হয়ে। স্টপেজে দাঁড়াল কি দাঁড়াল না, ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল স্মরজিৎ, লীলার মনে হল পড়ে যাচ্ছিল, হাতল ধরে কোন রকমে সামলে নিল। আহা, একখানা মোটে হাত!

একটু আগেই অভদ্র ব্যবহার করেছে, সে-জন্যে মনে মনে অনুতপ্ত হল লীলা। হয়ত সত্যিই ওর টাকার দরকার, পেমেণ্টের জন্যেই এসেছিল, শুধু পেমেণ্টের জন্যেই।

পরের রবিবার যখন দমদমের বাসে নিজে থেকেই চড়ে বসল, তখন লীলাও কম বিস্মিত হয়নি। নিজেকে বোঝালে, গত সপ্তাহে যে অপমান করেছি তার জন্যে মার্জনা চাইতে যাচ্ছি। এ শুধু 'ভদ্রতাবোধের' তাগিদ। কর্তব্য।

দু-এক বার ভুল করে রাস্তা সে চিনে বার করলও ঠিক। বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে স্বরজিৎ একটা বই পড়ছিল, লীলাকে দেখে ওর মুখে যে দীপ্তি দেখা গেল সেটুকু গোপন করতে চেষ্টাও করল না। বইখানা মুড়ে রাখল চেয়ারের হাতলে। চেঁচিয়ে ডাকল, 'পিসীমা, ও পিসীমা, দেখে যাও কে এসেছে।'

স্মিতমুখে পিসীমাও এসে দাঁড়ালেন দরজায়। 'এস, মা, এস।'

লীলা লক্ষ্য করল, সে এলেই এরা দু'জনেই কেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মৃতকল্প আবহাওয়ায় যেন স্পন্দন লাগে। বাইরে থেকে কেউ যে এত দূরে কষ্ট করে এসেছে, ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এই জন্যেই বুঝি পিসীমা কৃতজ্ঞ বোধ করেন। নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত দুটি প্রাণী যেন দিগন্তে শাদা পালের চিহ্নটুকু দেখা গেলেও উদ্বেল হয়ে ওঠে।

নিজের কাছে নিজেকেই কেমন অপরাধী মনে হতে লাগল লীলার। এরা তো কই জিজ্ঞাসা করল না, কেন এসেছ। কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া নেই, অভিযোগ নেই, এসেছে যে এতেই খুশি।

পিসীমা বুঝি কালির বড়িতে স্ট্যাম্প দিচ্ছিলেন, অল্প অল্প কালি লেগেছে তাঁর কাপড়ে, ঘাম মুছতে গিয়ে কপালেও। সেখানে গিয়ে লীলা বসে পড়ল।—'আমিও স্ট্যাম্প লাগাব, পিসীমা।'

'পিসীমা' সম্বোধনে নতুন একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়ে উঠল, সেটা ধরা পড়ল লীলার কানেও। চোখে-মুখে অকারণেই রক্ত ছড়িয়ে গেল।—'এ তো সহজ কাজ।'

—'তোমাদের কাছে সহজ বাছা, কিন্তু আমরা এই পেরে উঠি নে।'

ঘুরে ঘুরে সেদিন স্মরজিতের বাগান দেখলে লীলা। পোলট্রিও। আপাততঃ হাঁস-মুর্গী সব ডজন খানেক করে আছে, স্মরজিৎ বললে। শেয়ালে নিয়ে যায়, ঠিকমত দেখা-শোনা হয় না তো। তবু যখন ডিম দেবে—রোজ যদি ছ'ডজন ক'রে পাওয়া যায়, তবে বাজারে ডিম এখন দু'আনা করে—

—'থাক, অতো হিসেব করতে হবে না।' লীলা হেসে বললে। 'কেবল লাভের কথা ভাবলে চলে না, লোকসানের জন্যেও তৈরী থাকতে হয়।'

—'সে তো আছিই।' অন্য দিকে চেয়ে স্মরজিৎ আস্তে আস্তে বললে।

কিছুক্ষণ থেকে লীলা মৃদু ও মধুর একটা সৌরভ পাচ্ছিল—'কিসের গন্ধ বলুন তো?'

পেছন দিকে তাকিয়ে স্মরজিৎ বললে, 'নেবু-ফুলের।'

—'এমন চমৎকার?'

স্মরজিৎ একটা পাতা ছিঁড়ে আঙুলে অল্প একটু চটকে লীলার নাকের সমুখে ধরল, 'দেখুন দিকি। এতদিন নেবু খেয়েছেন, নেবু গাছ চেনেন না বুঝি?'

ঘুরে ঘুরে স্মরজিৎ ওব বাগান দেখালে। গোটা-কতক ফুল তুলে বেঁধে দিলে তোড়া করে। রোদ এরই মধ্যে কখন নিস্তেজ হয়ে এসেছে।

সীমানার বাইরের ক্ষেত থেকে অর্ধপক্ক রবিশস্যের ঘ্রাণ ভাসছে হাওয়ায়। সে হাওয়ায় ঠাণ্ডার অবসাদময় আমেজ। পায়ের নীচে নরম মখমলের মত ঘাসের ওপর খইয়ের মত ফুল ছড়ান। মাথার ওপর কখন থেকে এক ঘেয়ে গুন্ গুন্। কী? না মৌমাছি চাক বাঁধছে।

বাসে তেমন ভীড় নেই, তবু স্মরজিৎ যখন প্রথম দু'টো বাস ছেড়ে দিতে বললে, লীলা আপত্তি করলে না। শীতের পড়ন্ত বেলার আলস্যটুকুর ছোঁওয়া লেগেছে মনেও।

দমদমে গেল পরের রবিবারেও। তারপরের রবিবারও বাদ গেল না। ক্রমশ ফি রবিবারেই। ছুটির দিন এলেই কী এক দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে। প্রথমটা অস্বস্তি, ক্রমশ অস্থিরতা, অথচ কারণ বোঝা যায় না। শেষ পর্যন্ত প্রতি বারেই দেখা যায় দমদমের বাসে লীলা উঠে বসেছে।

গিয়ে যে খুব ভাল লাগে তা-ও নয়। কিন্তু খারাপও তো লাগে না। কী যেন একটা যাদু আছে, বন্ধুর অসমতল মাঠের, রবিশস্যের আঘ্রাণের, নিঃসঙ্গ ঘুঘু-কণ্ঠের, লেবু-পাতার মিষ্টি-মধুর সৌরভের। একখানা হাত শুধু দূরেই ঠেলে দেয় না, একটা রহস্যময় পদ্ধতিতে কাছেও টানে। সেই ছমছমে ঠাণ্ডা প্রায়ান্ধকার ঘরটায় ঢুকলে শরীরটা শিউরে ওঠে, রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু রোমাঞ্চ তো শুধু ভয়েই হয় না।

নিজেকে ক্রমশ একটা জালে জড়িয়ে ফেলছে লীলা, স্পষ্ট বুঝতে পারে। এদের দ্বৈত সংগ্রামের সঙ্গে অলক্ষ্যে কবে যেন নিজেও যুক্ত হ'য়ে গেছে। অথচ এ-তো সে চায় নি। স্মরজিতের তৈরী প্রসাধন উপচার নিয়ে

নিজের পরিচিত মহলে ইতিমধ্যেই দু'চার বার গেছে ; সাফল্যও, আশানুরূপ না হোক, পেয়েছে। পাঁচটাকার জিনিশও যেদিন চালাতে পেরেছে সেদিন আনন্দ হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে পড়েছে। আবার কখনো কখনো স্মরজিতের প্রতি অকারণেই সমস্ত চিত্ত বিরূপ হয়ে গেছে। কঠিন আঘাত করতে চেয়েছে এই মানুষটিকে। আবার পরক্ষণেই হয়ত নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়েছে। দোষ তো স্মরজিতের নয়। এ দ্বন্দ্ব লীলার মনের। নিজের রুচি আর অন্ধ আকর্ষণের সংঘাত। নিজের সঙ্গেই ক্লান্তিকর এক লুকোচুরি।

আবার নেশাও। জানে না ভবিষ্যৎ কী, জানে পরিণাম রমণীয় নয়। কিন্তু তবু রাশ টানতে পারে না। অস্বস্তিকর চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেই বুঝি লীলা সে সপ্তাহে খুব প্রাণপণ খাটলে। যখনই অবসর পেয়েছে, মিত্র কোম্পানীর মাল নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরেছে। সাফল্যও হয়েছে আশাতীত। পিসীমা যা পারেন না, এমন কি স্মরজিৎও নয়, তা লীলাকে দিয়ে যেন অনায়াসেই হয়। তার কাছ থেকে জিনিষ রাখতে দোকানদারদের বিশেষ আপত্তি নেই। কথা-বার্তায় লীলা স্মার্ট, আর লোকে তো বলে চেহারাটা এখন পর্যন্ত ভালোই। রবিবার গিয়ে স্মরজিৎকে হিসাব দিতেই স্মরজিৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।—'বলেন কি ? হাজার টাকা ? হাজার টাকার অর্ডার এক হপ্তায় ? বুঝেছি, আর বেশি বাকি নেই, আমার সংগ্রামের দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

—'আমি জানি, মা যখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন আর কোন ভাবনা নেই। মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।' পিসীমা পাশের ঘরে চা করতে চলে গেলেন।

সেদিন বহুক্ষণ ধরে ওরা কারবারের উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শ-পরিকল্পনা করলে। ল্যাবরেটরি ঘরটাকে আর একটু বড় করতে হবে। খবরের কাগজের মারফৎ প্রচার-ব্যবস্থারও সময় এসেছে। দু'জনে মিলে ওরা বিজ্ঞাপনের কপিও মুসাবিদা করলে একটা। আর,—আর দরকার হয় তো লোক রাখতে হবে আবো দু'-একটা।

—'এক জন লোক তো রেখেইছি,' স্মবজিৎ ঈষৎ হেসে বললে, 'তবে পার্ট টাইম, এই যা। আসে আর চলে যায়। তাকে চিরকাল ধরে রাখা যায় না। কিন্তু যদি যেতো। কি বলেন মিস্ সোম?'

লীলার মুখের সমস্ত রক্ত মুছে গেছে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও যেন স্তব্ধ। কিছুদিন থেকেই এই কঠিন মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করেছে, ভয় করেছে, দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। সেই মুহূর্ত এল আজ, শীতের এই দ্রুত ক্ষীয়মাণ দিনান্তে। কী উত্তর দেবে। ওর নিজেব সঙ্গে বোঝা-পডাই যে এখনো শেষ হয় নি।

এগিয়ে এসে স্মবজিৎ ওব কাঁধে ওর শক্ত ডান হাতখানা রাখলে। —'আমি জানি লীলা, এ প্রশ্নের জবাব এত সহজে দেওয়া যায় না। আমি তোমাকে সময় দিলুম। সব দিক্ ভেবে তুমি এক দিন, দু'দিন, —সাত দিন পরেই না হয় জবাব দিয়ো। আমার সবই তুমি জানো। আমার দিক্ থেকে তো জানাবার কিছু নেই—'

শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল। কঠিন একটা প্রয়াসে নিজের সমস্ত সত্তাকে ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লীলা। 'আমি পরে আবার আসব' ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে পারল শুধু।

পরে? কিন্তু কত পরে লীলা? সাগ্রহে স্মরজিৎ জিজ্ঞাসা করেছে,

কিন্তু জবাব পায় নি। লীলা দ্রুত পায়ে চলে এসেছে গেট খুলে সদর রাস্তায়, তারপর মুশুরি কলাইয়ের ক্ষেত আর পাখির কাকলি পিছনে ফেলে শ্যামবাজারের বাসে।

চার

দিন দুই বাদে এক দিন সকালে পড়াতে গিয়ে দেখল, বাইরের ঘরের সোফায় বসে কে খবরের কাগজ পড়ছে। ভঙ্গিটা মনে হল চেনে, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারল না। পড়াতে পড়াতে একসময় রুবিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের বাইরের ঘরে নতুন একজন লোক দেখলাম রুবি, কে বল তো।'

—'নতুন লোক?' ভ্রূ কুঁচকে বললে রুবি, 'নতুন আবার কোথায়! ওঃ, আপনি মামাবাবুর কথা বলছেন? জানেন লীলাদি, মামাবাবু আবার এসেছে।'

মামাবাবু? এক মুহূর্ত ভাবল লীলা। অনুপম এসেছে তা হলে, চিনতে তবে পেরেছিল ঠিক। কিন্তু অনুপমের স্বাস্থ্য এত ভাল হল কবে থেকে। ওর পায়ের শব্দে কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই নামিয়ে নিয়েছিল। টক্‌টকে ফর্সা মুখ, গাল দু'টি বেশ ভরা-ভরা। গেঞ্জিতে ঢাকা চওড়া বুক। এই যদি অনুপম হয় তবে আশ্চর্য রূপান্তর তো!

লীলার একবার জানতে সাধ হল, অনুপমের সে সব পাগলামি এখনো আছে কি না। কিন্তু রুবিকে সে সব কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না। ভুল বানান আর কোটেশনে ভর্তি চিঠিগুলোর কথা মনে পড়ে হাসি পেল।

রুবি বললে, 'জানেন লীলাদি, মামা অনেক টাকা করেছে। এখান থেকে কানপুর গিয়েছিল, সেখান থেকে হোসিয়ারপুর। সেখানে কনট্রাক্টারি করে না-কি বড়োলোক হয়েছে।'

পড়াতে পড়াতে লীলা দু'চার বার দরজার দিকে তাকিয়েছিল। চটি-পরা দু'টি পা পর্দার নীচে ঘুর-ঘুর করছে দেখতে পাবে আশা করেছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু অনুপমের আর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। হয়ত, এখনো ওর মনে লজ্জা আছে। হয়ত, হয়ত, ভুলেই গেছে। লীলা আবার পড়ানোয় মন দিলে।

লন পেরিয়ে গেট খুলেছে, ছাতাটাও খুলতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে কানে এল 'শুনুন।'

লীলা ফিরে তাকাল। অনুপম।

হাফ সার্ট আর ট্রাউজার্স। মুখে ফাল্গুনের সকালের নাতি-উষ্ণ রোদ। অনুপম নমস্কার করলে, 'চিনতে পারছেন না?'

লীলা যন্ত্রচালিতের মত প্রতি-নমস্কার করল। কিন্তু কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। যাকে মাস কয়েক আগে ধমকে দিয়েছিল, বেত্রাহত কুকুরের মত যে সমুখ থেকে চলে গিয়েছিল মাথা নীচু করে, এ যেন সে নয়।

অনুপম দু'পা এগিয়ে এল। 'আপনি সে সব কথা ভুলতে পারেন নি দেখছি। এক সময় যে সব ছেলেমানুষি করেছি, তার জন্যে আন্তরিক মার্জনা চাইছি লীলা দেবি!' একটু হেসে অনুপম আবার বলল, 'তা ছাড়া সে সময় আপনি আমায় শাসন করে ভালই করেছিলেন। নইলে হয়ত আমার চৈতন্য হ'ত না। জীবনে মানুষ হ'য়ে ওঠবার সময়ই পেতাম না।'

লীলা তাকিয়ে দেখল, অনুপম মানুষ হয়েছে সত্যি। স্বাস্থ্য তো আশ্চর্য রকম ফিরিয়ে ফেলেছে। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে একটা আত্মপ্রত্যয়ের ঋজুতা। কণ্ঠস্বরে সেদিনকার সেই ভিখারী আকুতির স্পর্শমাত্র নেই। পরিচ্ছদেও বেশ রুচির পরিচয় আছে অনুপমের। শার্টের হাতা থেমেছে কনুই অবধি, তার নীচে—বাঁ হাতটার সুপুষ্ট মণিবন্ধে সুদৃশ্য হাতঘড়িটির ব্যাণ্ড ভারী সুন্দর মানিয়েছে। সেদিকে চেয়ে লীলার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে অনুপম একবার নিজের বাঁ হাতটার দিকে তাকাল, তারপর হাত-ঘড়িটার দিকে। কুন্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী দেখছেন বলুন তো ঘড়িটায়? সময় ভুল আছে?'

লীলা অপ্রতিভ হয়ে বললে, 'না।' দৃষ্টি সরিয়ে নিলে। সে তো হাত-ঘড়িটা দেখছিল না, ওর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ওর বাঁ হাতটার দিকে, দু'টো হাত বুকের কাছে নিয়ে কেমন স্বচ্ছন্দে দাঁড়িয়েছে অনুপম। দু'—দু'টো হাত।

অনুপম বললে, 'আপনাকে আমাব আর মোটে একটি অনুরোধ করতেই বাকি আছে লীলা দেবি! সেদিনকার সব দোষ-ত্রুটী ভুলে যান। আমরা তো বন্ধুও হতে পারি?'

এবারেও কোন জবাব দিতে পারল না লীলা। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরতে কিছু দেরী হয়েছিল। মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গেছলি, দমদম বুঝি?' লীলা কোন জবাব দিলে না, মা আপন-মনেই বলে চললেন, 'কি-যে সুরু করেছিস, তুই-ই জানিস। ওই

হাত-কাটা স্মরজিতের সঙ্গে কিসের এত মেলা-মেশা। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে শুরু করেছে। ও ছোঁড়ার নিজেরই চাল-চুলোর ঠিক নেই। ওকে ব্যবসায়ে সাহায্য করছিস, ইস্কুলে ওর জিনিশ নিচ্ছিস, ভাল কথা। এর পরেও আসে কেন? ওর সঙ্গে নিজের জীবনটাকে জড়ালে তুই তো সুখী হবিই নে, এ দারিদ্র্যও ঘুচবে না, মাঝখান থেকে আমরাও না খেয়ে মরব। তোর ওপরই তো সব নির্ভর করছে মা!'

মা আরো সন্নিহিত হয়ে এলেন। নীচু-গলায় বললেন, 'একটা কথা বলব লিলি, ভেবে-চিন্তে জবাব দিবি। তুই যে বাড়ি পড়াস না, সে বাড়ির গিন্নী আজ দুপুরে এসেছিলেন। ভারী আলাপী মানুষ। এত বড়োলোক অথচ অহংকার নেই। কথায় কথায় বললেন, ওঁর এক ভাই আছে। দেখতে-শুনতে ভাল, পয়সাও আছে। কথার ভাবে বুঝলাম, তোকে ওঁদের খুব পছন্দ। এখন তুই যদি মত করিস—'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মা বললেন, 'কি, জবাব দিচ্ছিস না যে?'

ক্লান্ত গলায় লীলা বললে, 'আমি আবাব কী দেখব মা? তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।'

মা কাছে টেনে নিলেন মেয়েকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এই তো লক্ষ্মি! তোর ভালোর জন্যই বলা। বয়স পেরিয়ে যেতে বসেছে, তোকে দেখলে আমার দুঃখু হয় না ভাবছিস্? এ বিয়ে হলে দেখবি কত সুখী হবি। আমাদের সংসারটাও একটা আশ্রয় পেয়ে দাঁড়াতে পারবে। আর যদি ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে তোর জীবন জড়াস্—'

কিন্তু মা'র কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার প্রয়োজন ছিল না। লীলা স্থির করে ফেলেছে। স্মরজিতের সঙ্গে ওর জীবন আর জড়াবে না। স্মরজিতের

প্রশ্নের জবাব স্থির হয়ে গেছে। সংসারের কথা ভেবেছে লীলা, নিজের কথাও ভেবেছে, আর সংশয় নেই।

তবু যখন পরদিন শেষ জবাব দিতে গেল, পা দু'টো বার বার কাঁপল লীলার। বেলা শেষের ম্রিয়মাণ রোদে রবিশস্যের ক্ষেতের সবুজও আজ কেমন স্তিমিত। ওর পায়ের শব্দে একটা কাঠবিড়ালি পালিয়ে গেল আমলকি গাছের ডালে। হেলে-পড়া খেজুর গাছের সূক্ষ্মশীর্ষ পাতাগুলো বিঁধে গেছে পদ্ম-পাতায়। বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে শোনা যাচ্ছে অলক্ষ্যে, একক ঘুঘুব একঘেয়ে কণ্ঠ।

স্মরজিৎ বাইরে বসে নেই। শোবার ঘরেও তাকে দেখা গেল না। কাছাকাছি কোথাও আছে ভেবে লীলা একটু বসল। অন্যমনস্কভাবে টুল থেকে একটা পত্রিকা টেনে নিতেই মেঝেয় ঠক করে একটা শব্দ হল। ত্রস্ত হয়ে নীচের দিকে তাকাতেই লীলার দৃষ্টি স্থির, সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে গেল। নুয়ে পড়ে সেটাকে তুলে যথাস্থানে রাখবে এমন শক্তিও নেই।

স্মরজিতের কাঠের বাঁ হাতটা। স্যাঁতসেঁতে, স্বল্পালোক ঘরের ভিজে মাটির ওপর গড়িয়ে পড়েছে। এই পরিত্যক্ত ঘরে আর কেউ নেই, শুধু সে আর নিঃস্পন্দ একখানি কাঠের হাত, ভাবতেই আরেকবার কেঁপে উঠল লীলা। হৃৎপিণ্ড ধক্‌ধক্ করতে লাগল, অথচ উঠবে যে, ছুটে যে পালাবে, সে সামর্থ্যও নেই, পক্ষাহত প্রত্যঙ্গগুলোকে এই ঘরের মৃত আবেষ্টনীর সঙ্গে কে যেন কঠিন, নির্মম হাতে বেঁধে রেখেছে।

স্মরজিৎ ঘরে ঢুকল একটু পরেই। খালি গা, চুলগুলো ভিজে, কাঁধে গামছা। স্নান করে এল।

ওকে দেখে স্মরজিৎ একটু কুন্ঠিত হয়ে পড়ল। 'কতক্ষণ থেকে বসে আছো···আছেন। আজ ফিরতে দেরী হয়েছিল তাই অবেলায়—। পিসীমা আবার গেছেন দক্ষিণেশ্বরে।'

ঝুঁকে পড়ে টুলের ওপর কি যেন খুঁজল স্মরজিৎ, তার পর এদিক্-ওদিক্ তাকাতেই মেজেয় চোখ পড়ল। কুড়িয়ে নিলে কাঠের হাতখানা। গামছা দিয়ে যেন কতকটা স্নেহে মুছে ফেললে মাটি।

লীলা কাঠ হয়ে বসে বসে সব দেখল।

—'একটু বসুন, এখুনি আসছি' বলে, স্মরজিৎ আড়ালে চলে গেল। ফিরে যখন এল, তখন পরিপাটি করে চুল আঁচড়ান, বাঁ হাতটা অভ্যস্ত রীতিতে পকেটে।

তক্তপোষের ওপব লীলার কাছ্ ঘে সেই বসল স্মবজিৎ।—'তারপব লীলা, আমার সেদিনকার প্রশ্নের জবাব ঠিক ক'রে এসেছ ?'

লীলার ঠোঁটদুটো একবার কেঁপে উঠল, কোন কথা ফুটল না। আরো কাছে এসে ওর কাঁধেব ওপর ডান হাতটা রাখল স্মরজিৎ।—'জানি তোমার লজ্জা করছে। থাক, তোমাকে মুখ ফুটে আর বলতে হবে না। ফিরে যখন এসেছ তখনই তোমার উত্তব আমি অনুমান করে নিয়েছি।'

লীলার একখানা হিম হাত স্মবজিৎ ওর হাতেব মধ্যে টেনে নিলে। লীলার সারা শরীব আরেকবার কেঁপে উঠল। আব অপেক্ষা কবা চলে না। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। সমস্ত শক্তিকে অধবোষ্ঠে কেন্দ্রীভূত করে লীলা ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করলে, 'ফিরে আসিনি, ফিরে যেতে এসেছি।'

নির্বোধ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত লীলার দিকে চেয়ে রইল স্মরজিৎ। ওর হাত থেকে লীলার হাতটা শিথিল হয়ে খসে পড়ল। লীলার কথার যেন মানে বুঝতে পারে নি, এমন ভাবে রক্তহীন মুখে শুধু বললে, 'ফিরে যেতে এসেছ!'

উঠে দাঁড়াল লীলা। 'হ্যাঁ। ভেবে দেখলুম, হয় না। পারব না, আমি পারব না।'

অস্ফুট গলায় স্মরজিৎ বললে, 'পারবে না?'

—'না'। লীলা চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণ স্মরজিৎও উঠে দাঁড়িয়েছে। টলতে টলতে এগিয়ে এসেছে দরজা অবধি। 'পারবে না? কিন্তু কেন। কেন। কেন।'

যে হাতটা ক্ষণকাল আগে কোমল হয়ে লীলার কাঁধ স্পর্শ করেছিল, সেই হাতটাই অকস্মাৎ কঠিন ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে; প্রচণ্ড বেগে ঝাঁকুনি দিচ্ছে লীলাকে, আর ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করছে, 'কেন, কেন, কেন। কেন তবে এসেছিলেন? একদিন নয়, দু'দিন নয়, একবার নয়, দু'বার নয়, বার বার? কেন। কেন দিনের পর দিন এসে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, কাজের সহায়তা করেছেন। কোন মমতা যদি ছিল না, তবে কেন আমায় ভুল বোঝবার সুযোগ দিলেন? এ কি শুধু কৌতূহল? শুধু দয়া?'

লীলা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। অস্ফুট গলায় বলল, 'কৌতূহল, দয়া?'

ধীরে ধীরে লীলা এগিয়ে গেল। চাক থেকে উড়ে আসা দু'-একটা মৌমাছি উড়ছে ইতস্তত। বাতাসে মৃদুগন্ধ, কে জানে হয়ত নেবু-ফুলের। আকাশে সূর্যের শেষ আলোয় দু'একটি চিল ডানা-না-কাঁপানো সাঁতার দিচ্ছে। পথের ধারের পুকুরের পানায় চুপ ক'রে বসে আছে দু'একটি বক। আর সরু শাদা সিঁথির মত পথ ফসল-ধোয়া মাঠ পাড়ি দিয়ে দূরের

অশথ-বটের ছায়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তারপরেই ঝাপসা, তারপরেই অন্ধকার।

এই দীর্ঘ পথ ওকে একলা পাড়ি দিতে হবে ভাবতেই লীলার পা দু'টো অবশ হ'য়ে এল। হাঁটুতে যেন জোর নেই। চলতে গেলে লাউয়ের লতায় পা জড়িয়ে যায়, ফণি-মনসার কাঁটা আঁচল আঁকড়ে ধরে। এই নিরালোক, নিরানন্দ পরিবেশ তাকে কঠিন মায়ায় ঘিরেছে, বেঁধেছে দুশ্ছেদ্য মোহে। এই তমসা থেকে কেউ যদি তা'কে হাত ধরে জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারে, দিক। কিন্তু একা এই ক্লান্ত পথ পাড়ি দেবার কথা ভাবতেই লীলা ভয় পেল! অন্য দিন ওর সঙ্গে থাকত স্মরজিৎ। আর আজ— লীলা পিছনে ফিরে তাকাল।

চৌকাঠে হাত রেখে স্মরজিৎ কাঠের পুতুলের মত তখনো দাঁড়িয়ে। অবসন্ন ভঙ্গিতে দরজাটা ধরে আছে, পাংশু মুখখানা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর।

হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেয়ে চকিত হ'য়ে তাকাল স্মরজিৎ।

লীলা ফিরে আসছে।

প্রায় ছুটে এসে লীলা ওর পায়ের কাছে, মাটিতে ধপ করে বসে পড়ল। শিথিল আঁচল পড়ল লুটিয়ে। ওকে আস্তে আস্তে তুলল স্মরজিৎ, গভীর মমতায় কাছে টেনে নিলে। মোমের মত শাদা দু'খানি আকুল হাত কখন জড়িয়ে গেছে গলায়। বুকের ওপর সিক্তপক্ষ্ম দু'টি চোখের স্পর্শ। কান পাতলে শোনা যায় একটি দ্রুতশ্বাস, স্পন্দিত হৃদয়ের ওঠা-পড়া। আর পরম আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে কাঁধের কাছে খোঁপা-খোলা শ্রান্ত একটি মাথা এলান। ধীরে ধীরে সেই মুখখানি স্মরজিৎ তুলে ধরল। ফিরে যেতে পারেনি। ফিরে এসেছে।

পাখির বাসা

এই গল্পটি লিখতে কিছু সঙ্কোচ বোধ করছি, কেননা নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রী আমার চেনা। চেনা লোক নিয়ে গল্প রচনায় সচরাচর আমার রুচি নেই ; ওটা প্রায় কপি করার কাজ, রুল টানা কাগজে মক্সো করে হাতের লেখা ভাল করার মত। মানহানির ভয়ও উড়িয়ে দেবার মত নয়। নাম ভাঁড়িয়ে না হয় মান বাঁচান গেল, কিন্তু মনোমালিন্য ঠেকায় কে। তবু এ গল্পটি লেখার লোভ সামলাতে পারলাম না ; এই জন্যে যে এতে আমারও ছোট একটা ভূমিকা আছে। গুরুত্বে সেটা হয়ত কাটা সৈনিকের চেয়ে বেশি না। তবু তো ভূমিকা।

সর্বেশের বিয়ের সন্ধ্যাটি মনে আছে। টিপ টিপ বৃষ্টি, বিকেল থেকেই। ভিজে পীচের আয়নায় রাস্তার নার্সিসাস আলোর মুগ্ধ চোখ। পূর্বনির্দিষ্ট রেস্তোরাঁয় চা খাচ্ছি, আমি, দিব্যেন্দু আর অশোক। আইন মতে স্বাক্ষর-সিদ্ধ বিয়ে, আমরা তিনজন সাক্ষী।

একটু পরেই সর্বেশ একটি মেয়েকে নিয়ে এল। বোঝা গেল, এই পাত্রী। প্রথমেই মনে হল একে কোথাও দেখেছি, এই নতুন তামার পয়সার মত না-ময়লা, না-ফর্শা রঙ, অবয়বের এই অপুষ্টি, জড়োসড়ো ভঙ্গি, আমার পরিচিত। তবু ঠিক সনাক্ত করতে পারছিলাম না।

সর্বেশ বলল, উর্মিলা। চিনতে পারছিস না ?

মেয়েটি হাত তুলে ছোট্ট নমস্কার করল। এতক্ষণ ভেবেও কূল পাইনি, এই নমস্কারের ভঙ্গি পর্দা ঘুচিয়ে দিল। অনেক ঘষে ঘষেও

না-জ্বলা দেশলাইয়ের ভিজে কাঠিটা হঠাৎ যেন ফশ করে উঠেছে। ঊর্মিলাই বটে। সর্বেশের বাবার মুহুরির ভাইঝি। সর্বেশেদের পুরনো বালীগঞ্জের বাসায় নানা উৎসবে-ব্যসনে এই শ্যাম দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটিকে দেখেছি। কিম্বা দেখেও দেখিনি। সেখানে লনে টেনিস, লাউঞ্জে মিঠে পানি, গসিপের অনুপানসহ যা সেব্য, প্রজাপতি মেয়েদের মেরি-গো-রাউণ্ড। সর্বেশের পাশাপাশি এই মেয়েটিকে কখনো কল্পনাতেও দাঁড় করিয়ে দেখিনি।

ঊর্মিলাকে আজ নতুন করে দেখলাম। তিন-চারজন পুরুষের মাঝখানে পড়ে, স্পষ্ট অনুভব করলাম, বেচারী স্বস্তি পাচ্ছে না। ঘাম-ঘাম কপাল, চা জুড়িয়ে গেল, ছোঁয়নি।

যাক, শুভকাজ নির্বিঘ্নে চুকল। নামসই পর্বও সারা হল। রেজিস্ট্রারের প্রশ্নের ঊর্মিলা যথাযথ উত্তর দিলে। নম্র স্বর, মিষ্টি। একটু কাঁপা-কাঁপাও। সর্বেশ ঊর্মিলাকে পৌঁছে দিতে চলে গেল। পিশিমার বাসায় যাবার নাম করে ঊর্মিলা প্রায় ঘণ্টা চারেক আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল।

দিব্যেন্দু বলল, সর্বেশ যে রকম প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ চেয়েছিল, তা হল না। বড় সাধারণ।

অশোক বলল, তা হোক। গরীবের মেয়ে, সুশ্রী। ম্যাট্রিক পাশ করেছে বাড়ি বসে। আই. এ.-ও কিছুদিন পড়েছিল শুনেছি। আবার কী। এবারে খেয়ে পরে তো বাঁচবে। সর্বেশের বাবার তো টাকার কুলকিনারা নেই। আজকাল পাঁচশোর এক কড়া কম হলে কড়ে আঙুলেও ব্রীফ্ ছোন না, শুনেছি।

প্ল্যান ছিল, কিছুদিন গোপন বাখা হবে ব্যাপারটা। তারপব—'মধুর বহিবে বায়, ভেসে যাব রঙ্গে।' কিন্তু বিধাতাব মনে ছিল অন্য-রকম। সেদিনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। সর্বেশ এসে জানাল, সর্বনাশ। সব জানাজানি হয়ে গেছে। ও-বাড়ি উর্মিলাব ওপব অবর্ণনীয় অত্যাচার চলেছে ক'দিন ধরে। বক্ষণশীল বাঙালী পবিবারেব থার্ড ডিগ্রী পদ্ধতি। এদিকে সব কথা শুনে অবধি সর্বেশেব বাবা কোর্টে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। ছেলের সঙ্গে আপাততঃ বন্ধ করেছেন কথা, এব পব বোধহয় মাসোহারাও বন্ধ করবেন।

বললাম, তবে আলাদা বাসা কব। উর্মিলাকে তো ওখানে এভাবে ফেলে বাখা চলে না। নৈতিক দাযিত্ব তোব। টাকা আছে?

আছে, তবে সামান্যই। পকেট খরচ-বাঁচান হাজাব খানেক। মাকে বলে আবো কিছু সংগ্রহ হতে পারে। সর্বেশকে অধিকন্তু ভবসা দিলাম, বাবাব মন ফিবতে কতক্ষণ। বিশেষ, তুই একমাত্র ছেলে। আবম্ভটা যখন বহু আড়ম্বরেব, ক্রিয়া লঘু না হযে যায় না।

দিব্যেন্দু বলল, বেড়াল যেমন এদিক ওদিক তাকিয়ে চুপি চুপি এসে দুধ খেয়ে যায়, এসব ব্যাপার অভিভাবকেরা শেষ পর্যন্ত মেনে নেন তেমনি। উলু নেই, শাঁখ নেই, একদিন সকালে দেখা যায় বিনে-ববণেব বৌ ঘবে। উচ্চ মধ্যবিত্ত খুঁতখুঁতে নন, স্ক্যাণ্ডালকে বড ভয়।

—তোবা আমাব বাবাকে চিনিস না, বলে সর্বেশ সেদিনেব মত উঠে গেল।

হাজবা লেন অঞ্চলে ছোট একটা বাসা অনেক কষ্টে জোগাড হল। খানতিনেক ঘব। আবো ঠিক হল, বাইবের একটা বাডতি ঘবে অশোক

থাকবে। মাসিক বন্দোবস্তের অতিথি, অর্থসমস্যার খানিকটা তো আসান হবে।

বলা বাহুল্য সর্বেশেব পুরনো বালীগঞ্জের আয়েসী মন ছোট ছোট ঘর দেখে ভরল না। খুঁত খুঁত কবে বলল, এ যে পাখিব বাসা।

পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললুম, ঘাবডাও কেন ব্রাদার, এ বাসা হাওয়ায় নডবে না। এব ভিৎ বিশুদ্ধ প্রেমের ওপব।

গৃহস্থালীর প্রাথমিক টুকিটাকি কেনা হল। উর্মিলার কাকাও বিশেষ গোলযোগ করলেন না। শুধু খাওয়াবার একটা পেট ক'মল বলে নয়। সর্বেশের বাবাকেও তিনি আব পবোয়া কবতেন না, কেননা মুহুরিব চাকবি তাঁকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

উর্মিলা পতিগৃহে এল। আসল গল্পেব শুরু তখন থেকে। এখানে আরো একটা কথা পবিষ্কাব করে বাখা ভাল। অতঃপব যা লিখছি, সব আমার চাক্ষুষ নয়। অনেকাংশেই অশোকেব সাক্ষ্যের ওপব নির্ভব কবেছি। কেননা, অতিথি হিসেবে অশোকেব অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শনেব সুযোগ ছিল।

মাঝখানে মাস দুই কলকাতায় ছিলাম না। ফিবে এসে দিন দুই পবে মনে হল, দেখে আসি কেমন চলছে সর্বেশদেব ঘবকন্না। সর্বেশ ছিল, অশোকও। খুব আদর যত্ন কবল, খাতিব করে বসাল। শোবার ঘরখানা সর্বেশ, দেখলুম, সযত্নে সাজিয়েছে। জোড়া খাট, বেডিও, ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি ছাড়াও দেয়ালে দু'খানা ছবি ছিল। আমার দৃষ্টি অনুসরণ কবে সর্বেশ সগর্বে বললে, It's a real Degas. That's Cezanne

অভিভূত হতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ছবি আমার ভাল লাগেনা। অথচ

সর্বেশের টেবিলে, শেলফে, এমন কি বিছানার শিয়রে দেখলুম অসংখ্য পত্র-পুস্তিকা, সব শিল্প-সম্পর্কিত। জিজ্ঞাসা করলাম, নতুন করে চারুকলার চর্চ্চা করছিস ?

সর্বেশ ঔৎসুক্যে খুশি হল, বলল, না। উর্মিলা।

উর্মিলা ! আমার কণ্ঠের চমক সর্বেশকেও বিস্মিত করেছিল, মনে আছে। বলতে কি, কিছুতেই এই নম্রনত মুহুরির ভাইঝিকে চিত্রকলায় উৎসাহিনী হিসেবে ভাবতে পারছিলুম না।

—উর্মিলা আঁকেও যে। বলতে বলতে সর্বেশ ফিনফিনে কাগজে মোড়া খান কয় ছবি উন্মোচন করে দেখালে। আমি চিত্রকলার ব্যাপারে নিতান্ত প্রাকৃতজন। অপর্যাপ্ত রঙ আর অনিয়মিত রেখাই চোখে পড়ল, রূপ নয়। সর্বেশ বলল, ও-যে অসাধারণ, তা আমি অনেকদিন থেকেই জানি। কিন্তু ও ঠিক নিজেকে প্রকাশ করবার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। তুলির টানেই যে ওর মুক্তি, এটা আমিই ওকে বুঝিয়েছি। ভর্তিও করে দিয়েছি আর্ট স্কুলে। ওর পদ্ধতিটা ঠিক অবনী ঠাকুর টাইপের নয় বরং যামিনী রায়ের মত অনাড়ম্বর কিন্তু কারেজাস্। ডোণ্ট ইউ থিঙ্ক শী'জ্ প্রমিসিং ?

ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম।

উর্মিলা খাবার নিয়ে এল। তখনও শিল্প নিয়েই কথা চলছিল। সর্বেশ বলল, এবারে আমি আর কিছু বলব না। শিল্পী নিজেই যখন উপস্থিত, তিনি তাঁর অভিমত বলুন। উর্মিলা কিছুক্ষণ স্মিতআনত মুখে দাঁড়িয়ে রইল, সীলিং ফ্যানটা না থাকলে বুঝি ঘামতও। আরো একবার সর্বেশের দিকে চাইল, স্পষ্ট দেখলুম সে-দৃষ্টিতে অনুনয়। কিন্তু সর্বেশ ছাড়ল না।—বলো উর্মি, বলো।

তখন উর্মিলা শুরু করল। আঙুলে আঁচলের খুট জড়াতে জড়াতে, বাধো বাধো গলায়। কী বললে ভাল শুনলুম না, বুঝলুম না। মনে হল দম দেওয়া একটা স্প্রিংয়ের যন্ত্র থেকে আর্তনাদ উঠছে। কথা বুঝলুম না বটে, কিন্তু ভাসা ভাসা কতগুলো নাম কানে এলো: দা ভিঞ্চি, ভ্যান গঘ্, এল্‌গ্রেকো, তুলো-লত্রে, গগুইন—

সর্বেশ চোখ টিপল একবার, ভ্রুকুটিও করল, কিন্তু উর্মিলা ভ্রুক্ষেপ না করে বলেই চলল। আমি কিন্তু ভ্রুকুটির তাৎপর্য বুঝলুম। যতই অরসিক হই, শেষের নামটা আমারও পরিচিত। বোঝা গেল গগ্যাঁর নামেব উচ্চারণ বিকৃতিতে সর্বেশ রুষ্ট হয়েছে।

ফেরবার পথে অশোক আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিল। বাস্তায় নেমেই ক্ষুব্ধ গলায় বলে উঠলাম, সর্বেশ কী কবছে বলত? বৌটাকে একটা সং বানাচ্ছে?

অশোক বললে, আমি তো নিত্যই দেখছি। কিছু বলতে পারিনে। তোকে বলি নিশীথ, মেয়েটা হাঁপিয়ে উঠেছে। গরীবেব মেয়ে, কাকাব সংসারে শুধু বকুনি আর আধপেটা খেতে পেত। উদযাস্ত খাটুনিও ছিল। আর্ট-টার্ট নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসরই ছিল না। ভাল খেতে পরতে পাচ্ছে, এই জন্যেই সর্বেশেব কাছে কৃতজ্ঞ ছিল। এমনিতে তো মেয়েটিব বুদ্ধি আছে, জানে ছবিটবি ওকে দিয়ে হবে না। আঁকতেই চায় না, নানান ছুতোয় আর্ট ইস্কুলেব ক্লাস কামাই কবে। কিন্তু সর্বেশকে কিছু বলতে ভবসাও পায না। আমি বাজী রাখতে পারি, ও প্রথম যেদিন সুবিধে পাবে, ছবিটবিব বইগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে।

বললাম, কিন্তু সর্বেশ এমন ক্ষেপল কেন। গাধা যদি ঘোড়া হয়, ধীরে সুস্থে আপনা থেকেই হবে। পিটিয়ে নয়।

অশোক বলল, আসলে ওর মনে স্ত্রী সম্পর্কে একটা হীনতাবোধ থেকে এই সব জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ওর বড়োলোক আত্মীয়স্বজন, যাঁরা কালচার বলতে মূর্ছা যান এবং সর্বেশের কনে পছন্দর রুচি নিয়ে হাসিঠাট্টা করেন, তাঁদের সর্বেশ জানাতে চায় দুষ্কুল থেকে যাকে আহরণ করেছে সে স্ত্রী-রত্নই।

আরো একটা কারণ ছিল। সেটা আমি জানতাম। সর্বেশদের স্বাচ্ছল্য মাত্র দু'পুরুষের। ওর ঠাকুবদা কাঠের ব্যবসায়ে সফল হয়ে লক্ষ্মীকে অঙ্ক-শায়িনী করেছিলেন। ওর বাবা, যদিও উকিল, কিন্তু দৌড় আদালত পর্যন্ত, ওঁর পড়াশুনা নথি ছাড়িয়ে বেশি দূর এগোয়নি। তৃতীয় পুরুষে সর্বেশ এসেই এ-পরিবারের রুদ্ধ দেয়ালে শিল্পসংস্কৃতির জানালা ফোটাতে সংকল্প করল। আলমারি-ভর্তি অজস্র বই, দেশি-বিলিতি সব নাক উঁচু জার্নালের সর্বেশ গ্রাহক। কোন আর্ট একজিবিশন বাদ দেয় না, প্রত্যেকটি সংগীত সম্মেলনের সীজ্‌ন টিকিট কেনে। নিজে অসাধারণ, এই অহঙ্কার বরাববই ছিল। খান দুই রূপক-নাটক নিজেই লিখে বাড়ির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অভিনয় করবারও ব্যবস্থা করেছিল, ঠাকুর বাড়ির বিশুদ্ধ অনুকরণে। কিন্তু না পেল পরিবারের লোকজনের কাছে যথোচিত উৎসাহ, না এল কলা-রসিকদের স-প্রশ্রয় পিঠ-চাপড়ানি। নাটক দুটি ছাপতেও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোন সম্পাদকের উৎসাহ দেখা গেল না।

নিজের জীবনে যে অসামান্য হবার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে, সর্বেশ কি তার স্ত্রীর ভেতর দিয়ে আবার তাকে সফল করে তুলতে চাইছে? কিম্বা এমনও

হতে পারে, সর্বেশ এখনো ওর গোপন মনে এমন একটা ধারণা লালন করে যে, ও অসামান্য ; স্ত্রীকেও নিজের পর্যায়ে তুলে নিতে চাইছে।

আমার যা কাজ, তাতে একটানা কলকাতায় বেশি দিন থাকা পোশায় না। তামাম হিন্দুস্থান এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করতে হয়। এবাব যে বাইরে গেলুম, মাস ছয়েকেব আগে আর ফেরা সম্ভবই হল না। অফিসের কাজে সমস্ত দক্ষিণাপথ চষতে হল। ফিবে এসেও সাতটা দিন এমন ঝড়বৃষ্টি, বাসা থেকে বাইরে পা বাড়ানই গেল না। অষ্টম দিনে, জবাকুসুমসঙ্কাশ মহা-দ্যুতিকে আকাশে দেখতে পেয়ে নমস্কাব জানালাম। ভবসা হল এবাব বেরোন যাবে।

সর্বেশদেব বাসাব সিঁড়িতে পা দিতেই খটকা হল, ভুল বাসায় এলাম, নাকি ওরা বাসা বদলেছে। ওদেব ফ্ল্যাট থেকে স্পষ্ট বিদেশী বাজনাব আওয়াজ। ছবির ব্যাপাবে আমি যদি কানা হই, গানবাজনার ব্যাপাবে কালা, নইলে তক্ষুণি বোঝা উচিত ছিল, যে-যন্ত্রটি বাজছে তাব নাম গীটাব।

কিন্তু সর্বেশের বাসায কেন। দরজায় টোকা দিতেই খুলে গেল এবং আমি কোন কথা বলবার আগেই সর্বেশ ঠোঁটেব ওপর তর্জনী রেখে বলল, শ্‌ শ্‌ শ্‌। এবং আমার হাত ধবে সটান চলে এল শোবাব ঘবে। বলল, উর্মিলার ওস্তাদ এসেছে। মন দিযে গীটারটা শোন্‌।

শুনলাম, কিন্তু মন দিতে পারলাম না। একটা গৎ শেষ হল। আরেকটা শুরু হবাব আগেই সর্বেশ বলল, উর্মিলাই লেডি উইথ্‌ দি গীটার। এ লাইনে কী অদ্ভুত শাইন্‌ করছে, যদি জানতিস।

—গান শিখছে বুঝি ?

—টনসিলে দোষ, তাই কণ্ঠসংগীত না। গীটার, ভায়োলিন আর এসরাজ, আপাততঃ এই তিনটে শিখছে। ওস্তাদ তো আশা করেন মাস ছয়েকের মধ্যেই ও কম্পীট্ করতে পারবে।

ইতিমধ্যে ওস্তাদ চলে গিয়েছেন। উর্মিলা পর্দা সরিয়ে এ ঘরে এল। যন্ত্রটা রেখে দিল এক কোণে। চোখের কোলে অবসাদের কালি। নমস্কার করে বলল, কেমন আছেন। মনে হল এমন করুণ গলা অনেক দিন শুনিনি।

যা আশংকা করেছিলাম, তাই ঘটল। সর্বেশ ফরমাস করল, এসরাজে নতুন যেটা তুলেছ সেটা নিশীথকে শুনিয়ে দাও তো উর্মি।

উর্মিলা ক্লান্ত ছুটি চোখ তুলল। বোধ হয় বলতে চাইল, রেহাই দাও। কিন্তু দেয় কে। সুতরাং পোনের মিনিট ধরে যন্ত্রসংগীত শুনতে হল। ছড়ের টানে তারগুলো আর্তনাদ করছে; আমার কিন্তু মনে হল উর্মিলার কান্নাই শুনলুম। থামলে যথারীতি শিষ্টাচাবসম্মত অব্যয়টি উচ্চারণ করলুম, বাঃ।

উর্মিলা একদৃষ্টে চেয়েছিল। খুশি হল, না আমার কপটতাকে তিরস্কার করল বুঝতে পারলাম না।

একবাক্স রেকর্ড ছিল। প্রসঙ্গ ঘোরাতে সেটা টেনে নিলাম। কিন্তু নিরাশ হতে হ'ল। সর্বেশের দিকে চেয়ে বললাম, সব ইংরেজী ?

সর্বেশ হাসল। —ইংরেজী নয়, বরং বল্ ইউরোপীয়। দেখলুম, ভারতীয় সংগীতের চেয়ে ইউরোপীয় সংগীতের দিকেই উর্মিলার সহজাত পটুতা। ওস্তাদরাও তাই বললেন। এ রেকর্ডগুলো ও নিজেই পছন্দ করে কিনেছে। না উর্মি ?

ঊর্মিলা লজ্জিত হাসল। আরেকবার শঙ্কিত হ'লাম। কী জানি হয়ত এই মুহূর্তে সর্বেশের ইঙ্গিতে আধো আধো গলায় বিদেশী সংগীত সম্পর্কে একটা বক্তৃতা শুরু হয়ে যাবে। কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে আমাকে শুনতে হবে কতগুলা নামের ফিরিস্তি: বীটোফেন, শোপ্যাঁ, শুবার্ট,—

সেই মুহূর্তে ঊর্মিলা যদি 'চা আনছি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে না যেত, আমাকেই হয়ত উঠে পড়তে হ'ত।

রাস্তায় নামতে অশোকের সঙ্গে দেখা হল। হেসে প্রশ্ন করল, এতক্ষণ বাজনা শুনলি বুঝি? —হুঁ। কিন্তু হঠাৎ গান যে? ছবি কী দোষ করল।

—সে চুলোয় গেছে। গতবার ছাত্রদের একজিবিশনের জন্যে পাঠান সব কটা ছবি রিজেক্টেড্ হয়ে ফিরে আসবার পর থেকেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই সব ওস্তাদ রাখার পয়সা জুটছে কোত্থেকে।

—সে বড় মজাব ব্যাপার। সর্বেশের বাবা এদিকে বউ ঘরে নেবেন না ধনুর্ভঙ্গ পণ, ওদিকে মার বেনামায় টাকাও জুগিয়ে যাচ্ছেন ঠিক।

—আর সব খবর কী!

—কী আর। মেয়েটার জীবন অতিষ্ঠ। ওসব সিম্‌ফনি টিম্‌ফনিতে কি বাঙালী মেয়ের কান ভরে। ও চায় হারমোনিয়ম বাজিয়ে দু'একটা কীর্তনটীর্তন গাইতে। কিন্তু সর্বেশের কড়া শাসনে তা কি হবার যো আছে। আমি তো বুঝি, ঊর্মিলা হয়ত খুব প্রশংসা শুনে বিশ সপ্তাহ ধরে চলা একটা বাংলা ছবি দেখার জন্যে উশখুশ করছে; সর্বেশ তখন ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল কনসার্ট-হল্ মিউজিকে। যে চাল্‌তের টক দিয়ে ভাত

খেতে চায়, তাকে অনবরত প্যাটিজ-পেসট্রি-মাস্টার্ড-স্যাণ্ডউইচ এনে দিলে মনের ভাব কী রকম হয় বুঝিস তো।

এর পরের বার কলকাতায় ফিরে কী মনে করে সর্বেশদের সঙ্গে দেখাই করতে যাইনি। একদিন অশোক নিজেই এল। বললাম, আয়। আমি তোদের ওখানেই যাব যাব করছিলুম।

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে অশোক বলল, সর্বনাশ। ও মুখোও হ'সনে। মারা পড়বি।

—কেন? গান সহ্য হবে না ভাবছিস। তুই কি মনে করিস আমার সঙ্গে ললিত কলার ঘি-কুকুর সম্পর্ক?

—গান টান নয় বাবা, দর্শন আর কাব্য।

শিহরণটুকু গোপন করতে পারলাম না, অকপটে স্বীকার করছি। বললাম, দর্শন?

—হঁ্যা। সর্বেশ হঠাৎ আবিষ্কার করেছে ললিতকলা উর্মিলাকে দিয়ে হবে না। ওর পক্ষে জ্ঞানমার্গ ই প্রশস্ত। উর্মিলাকে বিদুষী করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

—কিন্তু প্রাথমিক পড়াশুনোর পক্ষে দর্শন কি খুব উপযুক্ত সবজেক্ট?

—সে-অসুবিধের কথা সর্বেশ যে ভাবেনি, তা নয়। কিন্তু জীবন সংক্ষিপ্ত, শাস্ত্র অপার। গোড়া থেকে শুরু করার সময় কই। উর্মিলা অকস্মাৎ সর্ববিদ্যা-পারঙ্গম হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিক, সর্বেশ বোধ হয় তাই চায়। বইয়ের স্তূপ সীলিংয়ে ঠেকল, সে-সব বই উর্মিলার ম্যাট্রিক-পাশ

দাঁতে একটু কড়া রকমের শুপুরী বইকি। এখন গেলেই দেখবি চায়ের পেয়ালায় দর্শন কিম্বা কাব্যেব তুফান উঠবে।

—কী রকম।

—তুই হয়ত সব জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিতে আক্ষেপ করে বললি, বেঁচে আছি যে এইটেই আশ্চর্য। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, সত্যিই বেঁচে আছি কিনা। উর্মিলা অমনি ঘাড় কাৎ করে বলবে, নিজের অস্তিত্বে সন্দেহ করতে পারছেন, সেইটেই তো আপনার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ নিশীথবাবু। আপনি না থাকলে সন্দেহ করত কে।

সর্বনাশ!

—কিন্তু ওখানেই থামবে না। সর্বেশের চোখ-ইশারাব চাবুক খেয়ে উৎসাহিত ঘোড়ার মত চলে যাবে। এমপিরিসিজম, পজিটিভিজম্, স্কেপ্‌টিসিজম্, এসব শক্ত কথা না শুনিস যদি, তবে অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিস। কিন্তু প্রসঙ্গ বদলাতে পারে। কাব্য আলোচনা একবাব স্থরু হলে আর রক্ষা নেই। রায়েলো রাশিয়াব যে যে কবির লেখায় মাটির গন্ধ সবচেয়ে বেশী আছে, তাদের নামেব লিষ্টি শুনতে হবে।

বলা বাহুল্য, সর্বেশের বাসার পথ আব মাড়ালুম না।

দিল্লীতে বসে অশোকের চিঠি পেলাম, উর্মিলা দর্শনপড়া ছেড়ে দিয়েছে; কাব্যচর্চাতেও ইতি। সর্বেশ আবো হিংস্র হয়ে উঠেছে; ওর নিজের মত স্ত্রীকে দিয়েও কিছু হবে না, এই আশঙ্কার ছায়া ওর চোখে স্পষ্ট। 'তুই শুনে অবাক হবি নিশীথ, মরিয়া হয়ে সর্বেশ মাঝখানে উর্মিলাকে

নাচ শেখানর কথাও ভেবেছিল। মেয়েটাকে পেট ভরে খেতে পর্যন্ত দিত না, বলত বেশী খাওয়াটা ভালগার। নেহাৎ উর্মিলার বয়স বেশী হয়েছে, কোমর ভারী, তাই নাচের কল্পনাটা বেশী দূর এগোয়নি।'

এই চিঠি পাবার সাতদিনের মধ্যে আমি কলকাতা ফিরে এলাম এবং যেদিন ফিরলাম তার পরদিনই চূড়ান্ত ঘটনাটা ঘটল।

* * * * *

এত অবাক হয়েছিলাম যে, নমস্কাব করতেও মনে ছিল না। বললাম, আপনি ?

উর্মিলা বলল, আমিই তো। অবাক হচ্ছেন ? কিন্তু আমার তো দাঁড়াবার সময় নেই নিশীথবাবু। এখুনি ফিরতে হবে। বাংলা থিয়েটার দেখতে এসেছি টের পেলে আপনার বন্ধু আমাকে আস্ত রাখবেন না।

চলুন, আমিও যাব।

ট্রামে পাশাপাশি বসে উর্মিলা আমার হাতের প্যাকেটটা চেয়ে নিলে। কী বই দেখি। সসঙ্কোচে এগিয়ে দিলুম, কেননা বইখানা একটা বাংলা গোয়েন্দাকাহিনী। মাসে পনের দিন আমার ট্রেণে কাটে। গোয়েন্দা-উপন্যাস জাতীয় হালকা বই দীর্ঘ জার্নির পক্ষে অপরিহার্য।

বললাম, ডিটেকটিভ্ বই, এ কি আপনি পড়েন ?

ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল উর্মিলা। পড়িনা বলছেন কী। আমাব ভীষণ ভাল লাগে যে। এক সময়ে ডিটেকটিভ নভেল পেলে আমার নাওয়া-খাওয়া ঘুচে যেত, জানেন ?

সিগারেট কিনতে রাস্তার মোড়ে একটু দাঁড়িয়েছিলাম। উর্মিলা আগেই ওপরে উঠে গিয়েছিল। মিনিট পাঁচেক পরে আমিও পর্দা সরিয়ে

ঢুকতে যাব, হঠাৎ উর্মিলার ত্রস্তসিক্ত কণ্ঠস্বর শুনে থমকে বাইরেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

—আর হবে না, এবারের মত মাপ কর।

একটু পরেই সর্বেশের ক্ষুব্ধ গম্ভীর কণ্ঠ : এত কবে তোমাকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি, তার পরিণতি এই ?

দু'পা পিছিয়ে এলাম। সর্বনাশ, সর্বেশ থিয়েটারে যাবার কথা টের পেয়ে যায়নি তো। সর্বেশ তখনো বলে চলেছে, 'আর তোমার হাতে ডিটেকটিভ নভেল, আমার যে মাথা কাটা যাচ্ছে। এমন রুচি তোমার ? ছি, উর্মিলা, ছি।'

সেই মুহূর্তে হাওয়ায় পর্দা উড়ে গেল, আমি বাইরে থেকেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম উর্মিলার মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে, ওষ্ঠাধর স্ফুরিত ; প্রবল আবেগে ওঠাপড়া করছে বুক, কী ঘৃণা বিকীরণ করছে চোখের মণি-দুটি। বশ্যতার মুখোস-খসা মুখ থেকে স্বচ্ছ কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল : এই আমার রুচি। বুঝতে তোমাব এতদিন লাগল, এই আশ্চয। চোখ দুটি তুমি যদি একদিনও খোলা রাখতে, তা হলেই বুঝতে পারতে, অসামান্য হতে আমার এতটুকু সাধ নেই। পায়ে পড়ি, আমি সাধারণ, তাই থাকতে দাও'।

—তুমি পাগল হয়ে গেছ উর্মিলা।

—পাগল ? উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল উর্মিলা, 'হইনি, তবে এভাবে চললে শীগ্‌গির হবো।' বলতে বলতে উর্মিলা অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, ঘরের কোণ থেকে অনাদৃত গীটারটা এনে মেঝেয় আছাড় দিয়ে বলল, 'আমি যদি পাগল হ'তাম, তা হলে অনেক আগেই এটার এ দশা হ'ত।'

একটা ফরাসী মাস্টারপীস তখনো টেবিলের ওপর হেলান ছিল, সেটাতেও দেশলাইয়ের কাঠি ছোঁয়াতে যাবে, এমন সময় সর্বেশ এসে ওর হাতখানা চেপে ধরল। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার নিষ্ফল প্রয়াসে চোখে জল এল উর্মিলার, বালিশের ভেতর মুখ ডুবিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। সর্বেশ একবার তাকাল ভাঙ্গা গীটারটার দিকে, একবার উর্মিলার দিকে। মুখ ফ্যাকাশে, ঠোঁটদুটি গেঁথে গেছে দাঁতে, কিন্তু কথা বলছে না।

আরো দাঁড়িয়ে দেখাটা অভদ্রতা হ'ত। নিঃশব্দে সেদিন বাসায় ফিরে এলাম। একটু অস্বস্তি ছিল, না জানি আরো কী কেলেঙ্কারি ঘটে। কিন্তু মনকে প্রবোধ দিলাম। এরা ভদ্রলোক তো, আঁচড়াবে না, কামড়াবেও না পরস্পরকে। হাতের নখ ঢেকে রাখবে দস্তানায়।

দিন তিনেক পরে এক সকালে অশোক উর্মিলাকে নিয়ে আমার বাসায় হাজির। অশোককে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কীরে ব্যাপার কী। বললে, গুরুতর। উর্মিলা মুক্তি চায়। মুক্তি! প্রত্যাশিত সংবাদ, তবু বিস্ময়ে আমার বাক্‌স্ফূর্তি হ'ল না।

অশোকেব কাছে আরো শুনলাম, এ তিনদিন উর্মিলা ক্রমাগত ঘোরা-ঘুরি করেছে এখানে ওখানে। যদি সাময়িক আশ্রয়ও জোটে। ওর কাকার বাসাতেও গিয়েছিল। ওঁরা রাজী হননি। নিজেদেরই অনেক কাচ্চাবাচ্চা, সকলের পেট ভরে ভাত জোটে না। কিন্তু অশোক বললে, একটা উপায় আমাদের করতেই হবে। অসামান্যতার মাচা থেকে মেয়েটাকে মাটিতে নামিয়ে না আনলেই নয়।

চেনা উকিলের কাছে যাওয়া গেল। সব শুনে তিনি বললেন, তাই তো, বড় স্ট্রেঞ্জ কেস। ক্লীব নয়, উন্মাদ নয়, ব্যাভিচারের কোন প্রমাণ নেই।

দুরারোগ্য বা ঘৃণিত কোন ব্যাধি নেই, শারীরিক কোন অত্যাচারের চিহ্নমাত্র নেই,—যত অত্যাচার সব মনের ওপর, রুচির ওপর জবরদস্তি। সামান্যকে অসামান্য করে তুলতে চায়, এটা আই. পি সি.'র কোন্ ধারায় পড়ে বলা মুশকিল। একেবারে না বলছি না, তবে ডিভোর্স হবে না। সেপারেশনের একটা ব্যবস্থা হতে পারে। কেসটা অবশ্য একটু সাজিয়ে নিতে হবে। চাইকি, উর্মিলার দিকে চেয়ে উকিল বললেন, খোরপোষেরও একটা বন্দোবস্ত হতে পারে।

আমেদাবাদে বসে অশোকের চিঠি পেলাম। উর্মিলার আলাদা থাকার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। শুনানী এক তরফা হয়েছিল। সর্বেশ কেস ডিফেণ্ড করেনি।

মাস কয়েক পরে কলকাতায় ফিরে অশোকের কাছ থেকে উর্মিলার নতুন ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে আহ্বান এল, আসুন। জানালার পাশে বসে উর্মিলা কী একটা সেলাই করছিল। আমাকে দেখে সারামুখে হাসি ছড়িয়ে গেল, একটা চেয়ার টেনে দিয়ে বললে, বসুন।

আগেই খবর পেয়েছিলাম উর্মিলা একটা স্কুলে চাকরি পেয়েছে। হেসে বললাম, মুক্তির রূপ দেখতে এসেছি। সিঁদুর ছড়িয়ে গেল উর্মিলার মুখে। নতমুখে দাঁত দিয়ে সুতো কাটল। বলল, বসুন চা নিয়ে আসছি।

সেই অবসরে আমি ঘরখানার ওপর দিয়ে চোখ দুটোকে ঘুরিয়ে আনলাম। ছোট একটি টেবিল, তক্তপোষে শয্যা, একটা কুঁজো, কাচের গ্লাস, কিছু খাতা, খান কয়েক বই। এক পাশে দড়িতে ঝোলান কিছু

জামাকাপড়। সামান্যই উপকরণ, তবু সাজানোয় পরিচ্ছন্ন একটা রুচি আছে।

কিন্তু দেয়ালে খানকয়েক বাঁধান ছবি আর টেবিলের নীচে একটা হারমোনিয়ম আর গ্রামোফোন দেখে বিস্ময়ের অবধি রইল না। এগুলোর ওপর উর্মিলার বিরাগের ইতিহাস জানি। অলস হাতে টেবিলের ওপরের খাতা ক'খানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই কয়েকটা স্কেচ্ বেরিয়ে পড়ল।

চা নিয়ে উর্মিলা ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার, আবার নতুন করে ছবি আর গানের চর্চা করছেন নাকি। উর্মিলা ঈষৎ আরক্ত হল। বলল, একটু আধটু। তবু আমার কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়নি, বোধ হয় বুঝতে পারল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উর্মিলা নিজেই বলল, লেখাপড়া বেশী শিখিনি তো, কোথাও চাকরি জোটে না। সব ইস্কুলেই নীচের ক্লাশে পড়াতে বলে, মাইনে অবিশ্বাস্য কম। এ ইস্কুলটায় গান আর ড্রয়িং টিচারের পোস্টটা খালি ছিল, ভাবলাম কিছু কিছু তো দুটোই জানি। সাহস করে নিয়ে নিলাম কাজটা। কিন্তু অল্পই জানতাম। ও ভাঙিযে আর কতদিন খাব। তাই বাড়িতে একটু আধটু শিখি। শেখানর লোক রাখার সাধ্য নেই, তাই রেকর্ড থেকে···ফি মাসেই খরচ বাঁচিয়ে কিছু কিছু কিনি।

হঠাৎ গলায় অস্বাভাবিক জোর দিয়ে উর্মিলা বলে উঠল, কিন্তু এ আমি বেশ ভালই আছি, নিশীথবাবু। নির্ঝঞ্ঝট, স্বাধীন, কারুর রুচিমত চলার ঝামেলা নেই। জানেন, কোর্ট থেকে আমাকে খোরপোষ দিতে চেয়েছিল; আমি নিইনি। বলুন তো, যার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে এলাম, তার টাকা হাত পেতে নিতে সম্মানে বাধে না ?

এমন সময় দরজায় কড়া নড়ে উঠল; উর্মিলা উঠে গেল, ফিরে এল একটা সেতার হাতে নিয়ে। যন্ত্রটাতে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলল, স্কুল কর্তৃপক্ষকে বলে আনিয়ে নিলাম। সবই একটু শিখে রাখা ভাল।

যে লোকটা সেতার নিয়ে এসেছিল তাকে বিদায় করতে উর্মিলা বাইরে গেল, সেই অবসরে আমি ঘরখানায় আবার দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলুম। দেয়ালের ছবি আর বিছানায় রাখা সেতারটার দিকে চোখ পড়তেই মনে হল উর্মিলা কত বড় ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বসে আছে। সর্বেশ ওকে মুক্তি দেয়নি। ওর পেছন পেছন এ-বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে; আর শেষ পর্যন্ত জিতেছেও সেই। তারই আগ্রহে শেখা ছবি এঁকে আব গান গেয়ে পেট চালান যে এক হিসেবে হাত পেতে খোরপোষ নেওয়ারই সামিল, উর্মিলার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে এটা বুঝতে পারেনি, ভেবে আশ্চর্য লাগল।

পনেরো টাকার বৌ

ঠেলা গাডিব সঙ্গে সঙ্গে প্রথম এসেছিল গৌবাঙ্গ, একটু পরে টুটুলকে কোলে নিয়ে এল মণিমালা।

তখনও জিনিসপত্র গোছান হয়নি। ভাঙা তোবঙ, ছেঁড়া তোষক, লক্ষ্মীব পট, ডালা-কুলো-কৌটো ঘরময় ছড়ান। ঘুলঘুলিব মত ছোট্ট জানালা দিয়ে শেষ বেলাব মবা আলো পড়েছে ঠিক আস্তর-খসা দেওয়ালে, ঘরের কোণে কোণে ঝুল, আধ-অন্ধকাবে একটা মাকডশা ওৎ পেতে বসে আছে।

মণিমালা একবার চাবদিকে চেয়ে নিল, টুটুলকে বসিয়ে দিল সেই আগোছাল হাঁড়ি ডেকচিব মাঝখানে, তাবপর হঠাৎ খিল খিল কবে হেসে উঠল।

গৌবাঙ্গ দেশলাই-কাঠি দিয়ে কানে সুখ-সুডসুডি দিচ্ছিল, নাকেও সেই কাঠিটাই দেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় অনর্গল হাসিব শব্দে চমকে তাকাল। কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে বলল, কী হল।

মণিমালা তবু হাসছে, ঘোমটা খসে পড়েছে হুঁস নেই, হাসিব শেষ নেই।

কিন্তু সেই শেষ। এব পবে মণিমালাকে অনেক দিন কেউ হাসতে দেখেনি।

পাকা বাড়ি থেকে খোলাব দোচালা। বেশী দূব নয়, ঢালু মসৃণ বাস্তা, নামতে কোন আযাস নেই, অন্তত শরীবেব নেই। তবু মণিমালাব চোখমুখেব ভঙ্গি কি বকম বদলে গেছে।

বিকাব নেই গৌবাঙ্গর। আসবাবের মধ্যে ছিল ঝাপসা একটা আয়না, এব মধ্যে সেটার ধুলো ঝাড়তে লেগে গেছে।

—এটা কোন্ দেয়ালে ঝোলাব বল তো, পুবে না পশ্চিমে। পশ্চিমেই ভাল, কী বল। এদিকে জানালা আছে, দিব্যি আলো রিফ্লেক্ট কববে, মুখখানা অন্তত দু' পোঁচ ফর্শা দেখাবে। এসে দাঁড়াও দেখি এখানে, কই এস ?

মণিমালা একচুল নড়ল না। হাসি নিবে গেছে, চোখেব মণি দুটো এখন নীল-নিশ্চল। গৌবাঙ্গ চোখ ফিবিয়ে নিলে। কিন্তু উৎসাহে ভাটা পডল না। বোঁচকাব মধ্যে ছিল মুখ-বাঁকান কাঁচি, সেটা দিয়ে গোঁফেব সংস্কাব করতে লেগে গেল। সব শেষে পডল জুলপি নিয়ে। বলল, কত বড জুলপি পছন্দ তোমার, চোখেব লেভেল, না কানের লতি। মাঝামাঝি একটা বফা করা যাক, কী বল।

টুটুলকে কোলে নিয়ে মণিমালা বাইবেব সিঁডিতে গিয়ে বসল। খোলা হাওয়া পেয়ে টুটুল খুশী, নিদাঁত মুখে কানছোঁয়া হাসি। ঘরেব ভিতবে গৌরাঙ্গ ফিলিম-গানেব এক কলি গাইছে, তাও শোনা গেল। ওদেব কোন বদল হয়নি ত, ওবা ঠিক আছে। শুধু মণিমালাব মুখেব হাসি মিলিয়ে গেছে। অনেক দেশ আব নগবী কবে নিশ্চিহ্ন হল, ইতিহাস সে কথা লিখে রাখে, কিন্তু একটি সামান্য মেয়েব মুখেব হাসি কবে নিঃশেষে মুছে গেল সে হিসাব কারও নেই।

এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় বড বাডির ছাত, যেখান থেকে মণিমালাবা এসেছে। তেতলা পাকা বাড়ি, চূড়ায় শ্রীকৃষ্ণেব ত্রিভঙ্গ মূর্তিব নীচে লেখা 'কৃষ্ণধাম, স্থাপিত তেরশ তিন সাল।' কার্নিশে সাজান ফুলেব টব, বাঁশের খুঁটিতে বেতাবেব তার জডান।

ওই বড় বাড়ির সবটা জুড়েই যে মণিমালারা ছিল তা নয়। তেতলার তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে এক প্রফেসর, তার পরিজন বলতে দূর সম্পর্কের এক ভাই, আর নিঃসন্তান বৌ। ফুলের টব তাদের। বৌয়ের নাম কেউ জানে না, মেয়ে মহলে তার চলতি নাম আশি টাকার দিদি, কেননা তেতলার ঘর তিনখানার ভাড়া আশি টাকা।

তাঁর সবচেয়ে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী দোতলার গিন্নী, শাঁসাল সরকারী চাকুরের স্ত্রী, থপ্‌থপে ভারী মানুষ, অনেক ছেলেপুলের মা। দোতলার পাঁচখানা ঘরের তিনখানা এঁর দখলে, রেডিওটাও এঁর। এঁরও একটা নাম অবশ্যই আছে, কিন্তু যেটা প্রচলিত, সেটা হল ষাট টাকার দিদি।

ষাট টাকার দিদি এমনিতে ভাল মানুষ, পানের বাটা সমুখে নিয়ে পা ছড়িয়ে সারাক্ষণ বসেই আছেন, জাঁতি নিয়ে শুপুরি কুচি-কুচি করছেন, কিন্তু আশি টাকার দিদির সঙ্গে বড় রেশারেশি। বলেন, আমার হার্টের ব্যামো, তিনতলায় উঠতে বুক ধড়ফড় করে, নইলে আশি টাকা ভাড়া কি আমি দিতে পারি না। করে তো কলেজের মাস্টারি, কতই বা মাইনে পায়, আমাদের উনি সিলেকশন গ্রেড পেয়েছেন সেও তো এই তিন বছর হয়ে গেল।

যে সায় দিয়েছিল তার দিকে এক খিলি পান বাড়িয়ে দিয়ে ষাট টাকাব দিদি বলেন, 'বড় দেমাক, বড় ঠ্যাকার। প্রথম যেদিন এল, সেদিন ওকে একটা পান দিয়েছিলুম, ছুঁলে না। বলে, পান খেলে দাঁত খারাপ হয়। মরে যাই। আমি তোমাকে বলে রাখলুম তিরিশ টাকার বৌ, আমার পল্টু তো আসছে বছর এনটেন্স পাশ দেবে, তখন ওই আশি টাকার দিদির সোয়ামীকে আমি পাইবেট মাস্টার রাখব।'

তবু, 'আশি টাকার দিদি' তিনিও বলেন। বলতে হয়।

দোতলার বাকী দু'খানা ঘরের অধিশ্বরী হল তিরিশ টাকার বৌ। স্বামী সদর রাস্তার মনিহারী দোকান 'সাবিত্রী স্টোর্সে'র দু' আনা পার্টনার, ষাট টাকার দিদির মাস-কাবারী সিঁদুর আর বড় মেয়ের পাউডার এই দোকান থেকেই আসে, সুতরাং সব কথায় ইনি সায় দিয়ে চলেন।

এ ছাড়া আছে চল্লিশ টাকার বৌ, কোন একটা দিশী কারখানার ক্যাশিয়ারের স্ত্রী, একতলার আড়াইখানা ঘর এঁর দখলে। দেড়খানা নিয়ে থাকেন পঁচিশ টাকার দিদি, সাইনবোর্ড পেণ্টার অনন্ত দাসের ঘরনী। একখানা ঘরে শোয়া-খাওয়া সব চলে, বাকী আধখানা সাইন-আর্টিস্ট স্বামীর স্টুডিও।

একখানা মাত্র ঘর নিয়ে ছিল মণিমালা। তার ঘরখানা সবচেয়ে অন্ধকার, তবু তো সেটা কৃষ্ণধাম। ছাতে দস্তুরমত কড়িবরগা ছিল, এ রকম খাপরার চাল নয়। পনেরো টাকার বৌ মণিমালা ষাট টাকার দিদির সমান না হক, সিকিভাগ সম্মান নিয়ে বেঁচে ছিল।

সিঁথির সিঁদুরে যেমন মণিমালা এয়োতি, কৃষ্ণধামের পরিচয়ে তেমনি ছিল ভদ্র। সে-পরিচয় জন্মের মত ঘুচে গেল, মণিমালার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে কি সাধে।

কালিঝুলি মাখা কতগুলো লোককে এদিকে আসতে দেখে মণিমালা ত্রস্ত হয়ে উঠল। ওরা বুঝি এই বস্তিরই বাসিন্দা, চেহারা দেখে তো মনে হয় মজুর কি বড় জোর মিস্ত্রী। মণিমালার দিকে তাকাতে তাকাতে যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকল। টুটুলকে বুকে চেপে ধরল মণিমালা, মাথার কাপড় ভাল করে টেনে দিল।

কৃষ্ণধামের লোকেরাও অবশ্য ওর দিকে তাকাত। ষাট টাকার দিদির বড় ছেলে গোবিন্দ, এখনও ভাল করে গোঁফই ওঠেনি, বই-পড়ার ছুতো করে বারান্দায় আসত, বইয়ের পাতার আড়াল থেকে ওকে দেখত। সাইন-আর্টিস্ট অনন্ত তো একেবারে সোজাসুজি তাকাত। মণিমালার কখনও রাগ হয়নি, বরং মজাই পেয়েছে। একজন কিশোর, আরেকজন সংসারী, পোষমানা ভদ্রলোক, বেশী বাড়াবাড়ি করতে ভরসা পাবে না। বড় জোর একটু আড়চোখে চাওয়া, একটু শিস।

কিন্তু বস্তির লোকগুলো তো অন্য গোত্রেব। মণিমালা শুনেছে এরা তাড়ি খায়, ঘরের মেয়ে মানুষকে ধরে মারে, পরের বৌ-ঝি টেনে বার করে। গৌরাঙ্গর ঠিকঠিকানা নেই, রাত-বিরেতে বাড়ি আসে, নয়ত ঘরের মধ্যে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়—মণিমালার গায়ে কাঁটা দিল।

রাস্তার কলতলায় উলঙ্গ ক'টি ছেলে নাচছে, জল ছেটাচ্ছে এব ওর গায়ে, মণিমালার পায়ের ঠিক নীচে বয়ে যাচ্ছে খোলা নর্দামার স্রোত। নাকে কাপড দিয়ে না হয় দুর্গন্ধ ঠেকান গেল, কিন্তু শরীরের সব ক'টি ঘৃণাকঠিন পেশীকে মণিমালা সহজ করবে কি করে।

সামনের বস্তির কোণের ঘরে কে একটা মেয়ে একটানা ককিয়ে ককিয়ে কেঁদে যাচ্ছে, ভিতরের উঠোনে দু'জন লোক হঠাৎ মোটা গলায় গান ধরল, গ্যাস পোস্টটার নীচে ছায়াছায়া ক'টা মূর্তি হিন্দী কি তার চেয়েও দুর্বোধ্য ভাষায় বচসা করছে।

মণিমালা আর বসে থাকতে ভরসা পেল না, ঘরে গিয়ে গৌরাঙ্গকে ঠেলতে লাগল, এই ওঠো, ওঠো, আজ না তোমার 'নাট্যপীঠ' থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার কথা।

গৌরাঙ্গ চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল, অবেলায় মাটিতে ঘুমিয়ে দৃষ্টি ঈষৎ-রক্তাভ, রোমশ দেহের উপরার্ধ খালি, নিম্নার্ধে মণিমালারই একটা ছেঁড়া শাড়ি কোনমতে জড়ান।

নিদ্রাতুব গলায় গৌরাঙ্গ বলল, সন্ধে হয়ে গেছে নাকি। উঠে রাস্তার কলে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে এল, গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে বলল, আচ্ছা, আমি তা হলে আসি। ফিরতে রাত হবে, ভয় পেও না।

ভয় মণিমালা পায়নি, কিন্তু ভবসাও নেই। দরজায় খিল এঁটে বসেছে বটে, কিন্তু জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলতে হাত সরছে না, থাক সব ছড়ান, কাল সকালে দেখা যাবে।

সবে তো রাত আটটা, এরই মধ্যে চারদিক নিঝুম, মাঝে মাঝে ঝুপঝাপ শব্দ, ইঁদুরগুলো নর্দামায় লাফিয়ে পড়ছে। আঙিনায় বেসুরো গলা দু'টি আরও উচ্চগ্রামে উঠেছে। আর কোন আওযাজ নেই, কেরোসিন বেশনেব রাত, ঘরে ঘরে রাতি নেবান।

সূক্ষ্ম দেহ ধারণ কবে মণিমালা নিমেযে সেই বাড়িতে চলে গেল, যেখানে এখনো ঘরে ঘরে বিজলী আলো। ষাট টাকার দিদির বড় মেয়ে সুস্মিতা হারমোনিয়াম সমুখে রেখে পাড়া মাথায় করছে; ছোট মেয়ের কী অসুখ হয়েছিল ছেলেবেলায়, সে চেঁচায় না, পটের বিবি হয়ে আয়নার সমুখে বসে থাকে, মাঝে মাঝে এ-গালে একটু রঙ মাখে ও-গালে একটু পাউডার বোলায়, সুর্মাদানে কাঠি ডুবিয়ে চাহনি স্নিগ্ধতর করে; সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হতেই ফিরে ফিরে চায়, অমূল্য আজ এখনও আসছে না যে। অমূল্য ওদের লতায়-পাতায় জড়িয়ে কি রকম যেন আত্মীয় হয়, ষাট টাকার দিদি তাকে মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মিশতে দিয়েছেন। আশি

টাকার দিদির প্রফেসর স্বামী সের বারো ওজনের একটা বইয়ে মুখ ডুবিয়ে আছেন, তাঁর দূর সম্পর্কের আশ্রিত ভাই প্রতুল রান্না ঘরে ভাজা ইলিশ খেতে খেতে ম্যাটিনিতে দেখা আসা ইংরেজি ফিল্মের গল্প বলছে। চোখ বড়-বড় করে আশি টাকার দিদি বলছেন, বল কী ঠাকুরপো; ওদেশের মেয়েরা এমন অসভ্য হয়। জলজ্যান্ত স্বামী রয়েছে, তার চোখের সমুখে—

রুমালে মুখ মুছে দেওর বলে, একটা সিগারেট ধরাই বৌদি?

—ধরাও না?

—দাদা যদি এসে পড়ে। দাঁড়াও, দরজাটা ভেজিয়ে দিই।

ও-পাশের ঘরে চল্লিশ টাকার বৌ লাইব্রেরি থেকে আনা বাংলা নভেল নিয়ে সেই সন্ধ্যার সময় কাৎ হয়েছেন, এখনও ওঠবার নাম নেই। ওদিকে উনুনে দুধ ধরে গেল, কেঁদে কেঁদে সারা হল কোলের মেয়েটা, চল্লিশ টাকার বৌ কি আর এ-জগতে আছে যে হুঁশ থাকবে।

সেই স্বর্গে তো ছিল মণিমালাও। কোন্ পাপে তার এমন দুর্গতি হল, কার শাপে। একটু একটু করে চোখ দু'টি জলতে থাকে, কিসে আশি টাকা, যাট টাকা, চল্লিশ টাকার দিদিরা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

রূপে? না। এত যে অভাবে অনটনে আছে মণিমালা, ভাল করে খায়নি কতকাল, ভাল একটা শাড়ি পরতে পায়নি, তবু শ্রীটুকু বজায় রেখেছে। পায়ের ওপর পা রেখে যে সব বৌ-ঝিরা আছে কৃষ্ণধামে, তারাও কিছু অপ্সরী উর্বশী নয়।

গুণেও না। মণিমালা ম্যাট্রিক পাশ করেছিল, আই. এ.-র বইও এনে রেখেছিল। শেলাইয়ের সার্টিফিকেট এখনও ওর বাক্সে তোলা আছে। হঠাৎ বিয়ে না হয়ে যেত যদি, মণিমালা আঙুলে হিসাব করল, এতদিনে এম. এ.

পাশ করবার কথা। কৃষ্ণধামে আশি টাকার দিদিই শুধু ম্যাট্রিক পাশ, ষাট টাকার দিদির বড় মেয়ে সুস্মিতা আই. এ. ফেল, আর কার পেটে কত বিগ্যে, মণিমালার জানা আছে।

বিয়ে অবশ্য বাবা-মা ওর ভাল হবে বলেই দিয়েছিলেন। গৌরাঙ্গ তখন এমন ছিল না। ফিটফাট, ছিপছিপে চেহারা, বইয়ে যাকে বলে তরুণ। বি. এ. পাশ, কী একটা কোম্পানীর সেলস্ অর্গানাইজার ছিল গৌরাঙ্গ।

সেই চাকরি এক কথায় একদিন গৌরাঙ্গ ছেড়ে দিল। ধীরে ধীরে চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির মত উপার্জনের জীবন তার ভাল লাগে না, গৌরাঙ্গ এবার থিয়েটারে নামবে।

থিয়েটার? উজ্জ্বল দীপমালা, প্রশস্ত প্রেক্ষাগৃহে মুগ্ধ সহস্র দর্শক, নয়নমোহন দৃশ্যপট, মঞ্চ, সেখানে তাব স্বামী, তারই, ঘনঘন হাততালি, মণিমালা রোমাঞ্চিত হয়েছিল।

একদিন পাশ পেয়ে মণিমালা থিয়েটার দেখতেও গিয়েছিল। বসে ছিল অনেকক্ষণ ধরে, যা কল্পনা কবেছিল তা-ই। দৃশ্যের পর দৃশ্য, অঙ্কে অঙ্কে যবনিকা, দীর্ঘ বক্তৃতা—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—মুহুমু্হু হাততালি, কিন্তু গৌরাঙ্গকে কোথাও দেখতে পেল না।

পরদিন দেখা হতে জিজ্ঞাসা করল। গৌরাঙ্গ বলল, ছিলুম তো। তবে আমার ছোট্ট পার্ট, ভিড়ের সীনে। তুমি দেখতে পাওনি?

মণিমালা দমে গেল। ওকে অভয় দিয়ে গৌরাঙ্গ বললে, পরের বইটাতে আমাকে বড় পার্ট দেবে, সুজিত বাবু বলেছেন।

মাস কাবার হল। মণিমালা রোজই আশায় থাকত, আজ গৌরাঙ্গ মাইনে পাবে। সাতদিন কেটে গেল, গয়লা, কয়লা, মুদী, বাড়িওয়ালা

বারবার তাগাদা দিয়ে ফিরে গেল। রেশনের দিন গত্যন্তর না দেখে মণিমালাকে মুখ ফুটে চাইতে হল।

—মাইনে পাওনি—

সিগারেটে পরিপূর্ণ টান দিয়ে গৌরাঙ্গ বলল, মাইনে, কীসের মাইনে?

মণিমালা হাসবে কি কাঁদবে ঠিক পেল না।—বাঃরে,. তুমি থিয়েটারে চাকরি করছ না?

ধোঁয়ার চক্র রচনা করতে করতে গৌরাঙ্গ বললে, তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ। আরে, নতুন চাকরি, তিন মাস তো এখন প্রবেশন। প্রবেশন বোঝ? বোঝ না। এ তিন মাস সুজিত মল্লিক আমাকে শুধু যাওয়া-আসা আর পান-সিগারেটের খরচা দেবে। রোজ পাঁচটা সিগারেট বরাদ্দ, কিন্তু কাল পুরো এক প্যাকেট হাতিয়েছি বাওয়া।

ক্রমে ক্রমে আসল রহস্য জানতে মণি-মালার বাকি রইল না। চাকরি গৌরাঙ্গ ছাড়েনি, চাকরিই ছেড়ে গেছে তাকে। বড়লোকের ছেলে সুজিত মল্লিক, কলেজ আমলের মুখচেনা, তাকে ধরে গৌরাঙ্গ থিয়েটারে ভিড়েছে। পার্ট এখনও পায়নি, হয়ত কোনদিন পাবে। মাইনে-পত্তর ঠিক অবশ্যই হবে, তার আগে সাত মণ তেল তো পুড়ুক।

কিন্তু সে-থিয়েটারে গৌরাঙ্গ টিঁকে থাকতে পারল না। সুজিত মল্লিকের সঙ্গে সামান্য ঝগড়া করে কাজ ছেড়ে দিল।

মণিমালা, তখন তার নাকছাবি গেছে, বলল, এবার?

মুচকি হেসে গৌরাঙ্গ বলল, সে-ব্যবস্থাও কি করিনি ভেবেছ।

গৌরাঙ্গ এবার গেল রঙ্গনিকেতনে। মাস পুরো হবার আগেই মণিমালার হাতে ষাট টাকা দিয়ে বলল, দেখলে?

আগেকার ফ্ল্যাটের ভাড়া ছিল চল্লিশ, মণিমালারা চলে এল কৃষ্ণধামে; ঘরভাড়া পনেরো টাকা, যা-হোক কোনক্রমে চলে যাবে।

তৃতীয় মাসের মাঝামাঝি সে-চাকরিও গৌরাঙ্গর গেল। কেন গেল, প্রথমে মণিমালার কাছে ভাঙেনি। বলেছিল, এ-লাইন হল রোলিং স্টোনের, যত গড়াবে, যত থিয়েটার বদলাবে, তত নাম, তত যশ, তত টাকা।

তারপর একদিন গৌরাঙ্গর মুখেই মণিমালা, তখন কানের দুল দু'টি গেছে পোদ্দারের ঘরে, চাকরি যাবার রহস্যটা শুনতে পেল। গৌরাঙ্গ সেদিন ঈষৎ মত্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিল। নেশার ঝোঁকে পা দু'টি জড়িয়ে ধরল মণিমালার, হাউ-মাউ করে কেঁদে বলল, অন্যায় করেছি, শাস্তি দাও।

কী অন্যায়, না সাজঘরে ময়নামতীর হাত ধরে টেনেছিল। অ্যাকট্রেসের হাত ধরে টানায় থিয়েটারী নীতিশাস্ত্রের কোথাও মানা নেই, তবে নাকি ময়নামতী অ্যাকট্রেসদের মধ্যে প্রধানা, খোদ ডিরেকটরের স্নেহ-নজর তার ওপরে, উদ্বাহু বামন গৌরাঙ্গকে তিনি অর্ধচন্দ্র দিয়ে দূর করলেন, নেহাৎ দয়াপরবশ হয়ে পুলিশে দিলেন না।

কাঠ হয়ে মণিমালা শুনছিল, মুখের সবটুকু রক্ত শুষে গেছে। গৌরাঙ্গর জবানবন্দি শেষ হতে একবার বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে এল আড়ি পেতে কেউ শুনছে কিনা।

অনেকদিন গৌরাঙ্গর কোন কাজ জুটল না। সারা সকাল গোঁফ আর জুলপির কেয়ারি করে কাটাল, সারা দুপুর মেজেয় গড়িয়ে গড়িয়ে তৈরি করল খাসা একটি ভুঁড়ি। শুধু সন্ধের দিকে বেরুত কাজের খোঁজে।

অনেক রাত অবধি মণিমালা, তখন গলায় হার গেছে, কোলে টুটুল, আশায় আশায় জেগে থেকেছে। গৌরাঙ্গ ফিরলে জিজ্ঞাসা করেছে, হল কিছু ?

গৌরাঙ্গ বলেছে, ফুঃ। বাজার বড় টাইট। থিয়েটারের পর থিয়েটার পট-পট উঠে যাচ্ছে, শালারা স্টেজ ভাড়া দিয়েই কূল পাচ্ছে না, অ্যাক্টরদের দেবে কী। নটকেশরীর নিজেরই এ-সীজনে কোন কনট্রাক্ট নেই, চুপ-চাপ বসে আছেন, দাড়ি কামানর আয়না সমুখে রেখে একলাই অ্যাক্ট করে যাচ্ছেন,—সেই সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশটা।

তিক্ত গলায় মণিমালা বলেছে, তুমি না লেখাপড়া শিখেছিলে ? থিয়েটারের আশা ছেড়ে দাও, অন্য কাজ দেখ। যা-হোক একটা ভদ্রলোকের চাকরি—

হাতের গ্রাস পাতে রেখে গৌরাঙ্গ চেঁচিয়ে উঠেছে, থিয়েটারের কাজ ভদ্রলোকের নয় ? আমরাই হলুম আসল ভদ্রলোক, অ্যাক্টর, আর্টিস্ট। মাস্টার-পেশকার, দোকানদার নই।

ছ'মাস ভাড়া বাকি পড়ল, বাড়িওয়ালার দরোয়ান লাঠি ঠুকে আস্ফালন করে গেল ওদের দরজায়। মণিমালা, ততদিনে তার মণিবন্ধও খালি, কোনমতে তাকে ঠেকিয়ে ঘরে ফিরে এল।

গৌরাঙ্গ তখন পোষা, পেয়ারের টিয়াটাকে ছোলা-ছাতু দিচ্ছে। ফিস ফিস করে বলল, চলে গেছে ?

—গেছে। খালি হাত দুটি নাড়িয়ে মণিমালা বলল, কিন্তু এবার ? আমার চুড়ি ক'গাছিও গেছে যে।

খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিয়ে গৌরাঙ্গ বলল, তা যাক। তেলে-জলে মানুষ, সিঁদুরে নোয়ায় সতী। তা তো তোমার কেউ কেড়ে নিতে পারছে না?

—কিন্তু কাল সকালে কোর্টের লোক এসে পথে বের করে দেবে যে।

—দেবে না। চোখ বুঁজে হাতে বরাভয় মুদ্রা করে গৌরাঙ্গ বলল, দেবে না। তার আগেই আমরা পালিয়ে যাব।

—পালিয়ে যাব?

—পালিয়ে যাব। দৃঢ়স্বরে গৌরাঙ্গ বলল। —আমি ঘর ঠিকও করে এসেছি। বেশি দূর নয়, এই মোড়টা ছাড়িয়ে দু'পা মোটে।

দূর নয়, তবু দূর। কত দূর, আজ এই খোলার চালের নীচে ছত্রখান হাঁড়ি-কুড়ির মধ্যে বসে টের পাচ্ছে কৃষ্ণধামের পনের টাকার বৌ। ঝুপ ঝাপ, ঝুপ ঝাপ, ইঁদুরগুলোর জলকেলি এখনও শেষ হয়নি, ভরসা পেয়ে আরশোলার ঝাঁক চৌকাটের নীচের গর্ত থেকে উঠে এসেছে, আধ-অন্ধকার দেয়ালের কোণে বিনিদ্র একটা মাকড়সা তখন থেকে জাল বুনে চলেছে। ওদিকে ঝাঁপবন্ধ ঘরের ভিতর থেকে এখনও শোনা যাচ্ছে একটি মেয়ের একটানা এক-ঘেয়ে ককানি।

চুপে চুপে চলে এসেছে ওরা। ষাট টাকার দিদির ঘরে পানের বাটা ঘিরে তখন মহিলা মজলিশ, বিজলীপাখাশীতল তেতলার ঘরে আশি টাকার প্রফেসর দিদির চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু, ঠেলাগাড়ির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বেরিয়ে পড়েছে গৌরাঙ্গ, একটু পরে টুটুলকে কোলে নিয়ে মণিমালা।

কেউ টের পায়নি।

ঘুম ভেঙে উঠে মণিমালা দেখল, গৌরাঙ্গ এরই মধ্যে কখন উঠে টিয়াপাখিকে ছোলা-জল খাওয়াতে বাইরে নিয়ে গেছে। প্রতিবেশী দু'-একজনের সঙ্গে ইতিমধ্যে ভাবও জমে গেছে তার। আড়াল থেকেই মণিমালা শুনল, দস্তুরমত বক্তৃতা করে গৌরাঙ্গ কাকে যেন কী বোঝাচ্ছে।

কবাট একটু ফাঁক করে মণিমালা উঁকি দিল। শ্রোতাদের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী, মোটা লোক, হাফপ্যাণ্ট পরে দাঁতন করছে। কাল সন্ধ্যায় বেসুরো গলায় যারা গান ধরেছিল, এই লোকটাই হয়ত তার একজন। আরেকটা লোক—রোগা সিড়িঙ্গে, ওর মুখের রগগুলো এখান থেকে দেখা যায়, গোনা যায় বুকের হাড় ক'খানা—উঠোনে উবু হয়ে বসেছে। গৌরাঙ্গ যা বলছে তাতেই ঘাড় নেড়ে বলছে, ঠিক ঠিক।

মণিমালা কবাটটা বন্ধ করে দিল।

গৌরাঙ্গ ফিরে এলে বলল, ওই লোকগুলোব সঙ্গে তুমি কী এত কথা বলছিলে।

থতমত খেয়ে গৌরাঙ্গ বলল, কেন, কী হল।

ঘৃণাকুঞ্চিত মুখে রুদ্ধস্বরে মণিমালা বলল, নির্লজ্জ, বেহায়া। সব তো খুইয়েছ, সামান্য সম্মানটুকু তাও তুমি রাখলে না। যতসব ছোট-লোকদের সঙ্গে গলাগলি—

ভুরু কুঁচকে গৌরাঙ্গ বলল, ওরা ছোটলোক কিসে।

—নয? বস্তিতে থাকে—

গৌরাঙ্গ এবাব হো-হো করে হেসে উঠল।—আজগুবী যত ধারণা তোমার। ওদের সঙ্গে আমার তফাৎ কী বলত ?

—নেই ?

একটু ভেবে গৌবাঙ্গ বলল, আছে। ওরা বিডি টানে আব আমি একটা শস্তা সিগাবেটই বাববাব নিবিয়ে নিবিয়ে খাই।

—আর কিছু না ?

—আর কিচ্ছু না। মণিমালার কানের কাছে মুখ নামিয়ে গৌরাঙ্গ বলল, ওরা কে জান। ওদেব একজন বালতিব কারখানাব হেডমিস্ত্রী, আরেকজন বাজনা মেবামতেব দোকানেব কাবিগব। ওবা আর্টিজান, আমি আর্টিস্ট।

মণিমালার জবাবেব অপেক্ষা কবে গৌবাঙ্গ বলল, দাও দেখি কিছু পয়সা, বাজাবটা ঘুরে আসি। আমাকে আবাব বেরুতে হবে।

মণিমালা তবু প্রশ্ন কবল না দেখে গৌবাঙ্গ নিজেই বলল, একটা টিপস্ পেয়েছি। এবাব আব থিয়েটাব-টিয়েটাব নয়, ফিল্ম। কাল এক জায়গায় কথা বলে এসেছি। প্রথমে অবিশ্যি কিছুদিন এক্সট্রা থাকতে হবে, তাই বা মন্দ কী। ফ্রী ট্রান্সপোর্ট, ক্যাশ ডাউন। তোমাকে একদিন স্যুটিং দেখিয়ে আনব। কই, বাজাবেব পয়সা দাও ?

আঁচলে একটা আধুলি বাঁধা ছিল, গিঁট খুলে মণিমালা সেটা ছুঁড়ে দিল।

গৌবাঙ্গ বাজাবে বেবিয়ে গেল, একটু পবেই দবজা ঠেলে ঘরে ঢুকল একটি বৌ। বঙ ময়লা, নিরাভবণ হাত দু'টি লিক্‌লিকে, কপালে বড় করে টানা সিঁদুবের টিপ। গায়ে একটা সেমিজ পর্যন্ত নেই, আধ-ময়লা

শাড়ির নীচে সরু সরু দু'টি পা হাঁটু অবধি দেখা যায়, পায়ের ফাটা-ফাটা দুটি পাতায় কতকাল আগে পরা মুছে-আসা আলতার দাগ।

বৌটি বলল, বসব?

মণিমালা হাঁ-না কিছু বলল না। একে আপনি বলবে, না তুমি, ঠিক করতেই কয়েক পল কাটল। শেষ পর্যন্ত সাহস করে বলল, তুমি বুঝি এখানেই থাক।

বৌটি বলল, এই তো, পাশের ঘরেই। আমাদের উনি আজ আপনার কর্তার সঙ্গে আলাপ করছিলেন। আপনারা আগে কৃষ্ণধামে থাকতেন, না?

মণিমালা বলল, হুঁ।

বৌটি হঠাৎ বলল, আপনার বরটি বেশ ভাই। শুনলুম ভাল পাট করেন। আমাদের ওনাকে পাশ দেবেন। আমার তৈরী চা নিজে সেধে নিয়ে খেলেন।

মণিমালা হঠাৎ বলল, আচ্ছা কাল রাত্তিরে কাঁদছিল কে। অনেকক্ষণ ধরে ককিয়ে ককিয়ে।

বৌটি মণিমালার কাছ ঘেঁষে এল, ফিস্ ফিস্ করে বলল, আপনি শুনেছেন? সে, দিদি, এক কেলেঙ্কারি। ওদিককার ঘরে ষণ্ডাগোছের একটা হিন্দুস্থানী থাকে, সে মাসখানেক হল একটা মেয়েকে এনে লুকিয়ে রেখেছে।

মণিমালার হাত-পা ভীরু কচ্ছপের মুখের মত ভিতরে সেঁধে গেল। —লুকিয়ে রেখেছে। লোকে পুলিশে খবর দেয় না?

—সাহস পায় না। লোকটা শুনি এ পাড়ার গুণ্ডাদের সর্দার। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখে, বেরিয়ে যাবার সময় তালাচাবি এঁটে

দিয়ে যায়। মাঝে মাঝে কী মারটা যে মারে, দিদি, মেয়েটার প্রাণফাটা চীৎকার শুনলে আপনাব চোখে জল এসে যেত।

চোখে জল এসেছিল মণিমালার, ভয়ে। কোনমতে দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে সামলে নিলে। ঠিক তখুনি টুটুল ঘুম ভেঙে চেঁচিয়ে উঠল, মণিমালা যেন বাঁচল, ছুটে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধবল।

বৌটি বলল, খোকার বুঝি খিদে পেয়েছে। সকাল থেকে দেননি কিছু?

—ও-বাড়ি বোজ দুধ ঠিক কবা ছিল, গয়লাকে তো ঠিকানা দিয়ে আসা হয়নি।

—গয়লা? কৃষ্ণধামে যে গয়লা দুধ দেয়, দিদি?

মণিমালা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

উজ্জ্বল চোখে বৌটি বলল, সে তো এখানেই থাকে, এই চাবখানা ঘর পরেই, আপনি জানেন না বুঝি? ডেকে আনি?

—না!

হঠাৎ সমস্ত জোর দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মণিমালা, বৌটি ভয়ে বিস্ময়ে তিন পা পিছিলে গেল। টুটুল চমকে উঠে আবও বিকট গলায় কেঁদে উঠল, মণিমালা নিবিড় কবে ওকে জড়িয়ে ধবল বুকে। বুকে কিছু নেই, টুটুল আবও চেঁচাবে, চেঁচাক, কেঁদে কেঁদে সাবা হযে যাক। তবু যে-গয়লা তাকে সেলাম কবত, মাইজী বলত, প্রাণ গেলেও মণিমালা তাকে জানতে দেবে না, ও-বাড়ির পনেবো টাকার বৌ তাবই সঙ্গে এক বস্তিতে বাসা নিয়েছে।

অনেকক্ষণ চুপ কবে থেকে বৌটি বলল, এবারে যাই, দিদি। দুপুবে আবাব আসব।

—এস। মণিমালা যান্ত্রিক অভ্যাসে বলল, কিন্তু হাসল মনে মনে। দুপুরে এসে বৌটি তাকে এ-ঘরে খুঁজে পাবে না। আজ দুপুরে কেন, কোন দুপুরেই না। কোথায় যাবে, মণিমালা ঠিক করে ফেলেছে।

রোজ দুপুরে ষাট টাকার দিদি মেঝেয় দুপা ছড়িয়ে বসেন। পানের বাটা সামনে, জাঁতি হাতে কুচি-কুচি করে শুপুরি কাটেন, খয়ের, জায়ফল, এলাচ, অন্যান্য মসলা সামনেই সাজান থাকে।

প্রথমে আসে চল্লিশ টাকার বৌ। ষাট টাকার গিন্নী হেসে বলেন, এস, এস। কর্তা বুঝি এই বেরুল?

চল্লিশ টাকার বৌ একেবারে গিন্নীর কোল ঘেঁষে বসে, পোষা বেড়ালের মত। বলে, দিন দিদি, আমি শুপুরি কুচোই।

গিন্নী বলেন, থাক, থাক, তোমার হাত কেটে যাবে। সেদিন মাছ কুটতে গিয়ে আমাদের ওপরের ওনার কী হয়েছিল, জান না? বলে মুখ টিপে হাসেন।

ভাল মানুষের মত চল্লিশ টাকার বৌ বলে, মাছ তো ওর দেওর কেটে দেয় শুনেছি।

ফিক্ করে হেসে গিন্নী বলেন, তবে আর বলছি কেন। সেদিন কী হয়েছিল জান না বুঝি?

ততক্ষণে নীচে থেকে পঁচিশ টাকার বৌ এসে জুটেছে, সাইনবোর্ড পেণ্টারের ঘরনী, তার পিছনে দোতলার তিরিশ টাকার বৌ, সাবিত্রী স্টোর্সের দুআনা মালিক স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে এই মাত্র ছুটি পেল।

গিন্নীর মেয়েরাও আছে, তবে একটু দূরে, একজন ইংরেজি উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত, একজন তার নখ দিয়ে।

ষাট টাকার গিন্নী সবাইকেই সহাস্যে ডাকেন, এস বৌ, বস। তিরিশ টাকার বৌকে গিন্নী বলেন, কেমন যেন রোগা রোগা দেখছি, আবার বুঝি— ?

বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করেন না, শ্রোতারা ঠিক বুঝে নেয়। তিরিশ টাকার বৌ লাল হয়ে দু হাতে মুখ ঢাকে।—কী যে বলেন দিদি।

দিদি বলেন, আহা লজ্জা কী। আমরা তো আপ-টু ডেট নই, তেমন বিদ্বান সোয়ামীর হাতে পড়িনি, ওষুধ-বিসুধ কত কি আছে, খেতে প্রবৃত্তিও হয় না।

ইঙ্গিতটার লক্ষ্য তিনতলার প্রফেসারের বৌ। শ্রোতাদের একজন চাপা গলায় বললে, খায় বুঝি।

আরেকজন বললে, বিদ্বান সোযামী, কিন্তু তাকে কেয়ার করছে কত। সেদিন ছাতে কাপড় শুকোতে গেছলুম, জিভ কেটে শেষ পর্যন্ত পালাতে পথ পাই না।

পানের বাটা ঘিরে কৌতূহলী চক্র আরও ছোট হয়, উৎসুক কয়েকটি কান পরস্পরের সন্নিহিত হয়ে আসে।

হঠাৎ কখন দীর্ঘ একটি ছায়া পড়ে ঘরের মেঝেয়, দরজার পাশে আধ-ময়লা শাড়ি-ঘেরা দু'টি পা, নিরাভরণ শঙ্খসম্বল কৃশ-কুণ্ঠিত দু'টি হাত চৌকাট ধরে আছে, কেউ লক্ষ্যও করে না।

—কী দেখেছিলে, ভাই, কী দেখেছিলে। আন্দাজে ধরে নিয়েছে সবাই, তবু স্বকর্ণে শুনে আশ মেটাতে চায়।

বক্তাব কণ্ঠ আরও নীচে নেমে যায়, তবু শুনতে পায় সকলে, চোখে চোখে চটুল ইঙ্গিতে একটি কলঙ্ক-কাহিনী ভাষা পায়।

ষাট টাকাব দিদি বলছিলেন, স্বামী অমন ব্যোম-ভোলানাথ, তাই এমন সাহস পায়, পডত আমাদের ওনাব মত কারুব হাতে, লাথি মেবে রাস্তায় কবে দূর কবে দিত।

হঠাৎ চল্লিশ টাকার বৌ ঠোঁটে তর্জনী রেখে বলে, চুপ, চুপ। কে যেন দবজাব পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, না ?

চৌকাটে হাত বেখে দাঁডান শীর্ণকুণ্ঠিত ছায়ামূর্তিটিব দিকে এতক্ষণে সকলেব নজব পডে। ও কে ? সেদিন দুপুরে ভাডা না দিয়ে চুপে চুপে যাবা সবে পডেছে, সেই পনেবো টাকাব বৌ, না ?

অপ্রসন্ন মুখে বড গিন্নী বলেন, বস।

পাটিতে বসতে ভবসা পায় না। সঙ্কুচিত মণিমালা শানেব ওপরই বসে। লজ্জিত, ত্রস্ত, কম্পিত স্ববে বলে, দেখা কবতে এলুম।

অনেকক্ষণ কোন কথা হয় না, ষাট টাকাব গিন্নীব হাতে জাঁতি দ্রুত চলে, বেকাবে শুপুবি কুচিয়ে পডে।

অনেকক্ষণ পবে তিবিশ টাকাব বৌ পুবনো কথাব জের টেনে বলে, আমাব তো মনে হয় ওব স্বামী কিছু এখনও টেব পায়নি। পেলে, হাজাব হোক, পুরুষ মানুষ, কিছুতেই—

চোখেব ইসাবায বড গিন্নী ওকে চুপ কবতে বলেন। সেই অন্তরঙ্গ নিয়ে বচিত আসবটুকু এখন আব নেই, জাতিচ্যুত একটা মেয়ে যেচে ভাব পাতাতে এসেছে, কে জানে ওব মনে কী আছে, হয়ত স্পাই, হয়ত একখানা কথা সাতখানা করে ওপবে গিয়ে লাগাবে।

চল্লিশ টাকার বৌয়ের হাতখানা টেনে নিয়ে বলেন, চুড়ি কি ভেঙে তৈরি করলে বৌ, না নতুন গড়িয়েছ।

অপ্রতিভ চল্লিশ টাকার বৌ হাতখানা টেনে নেয়। —ভেঙেই গডালুম দিদি, নতুন কোথায় পাব, যা বাজাব পড়েছে। মজুরী ছাড়া এক ভরি বেশি লেগেছে, তাতেই উনি খচখচ কবছিলেন। আপনার হাবটা তো নতুন, দিদি?

বুকেব কাপড টানতে গিযে ষাট টাকার দিদি আরও সরিয়ে দেন, হারটা যাতে সকলের স্পষ্ট নজবে পডে। —নতুনই কবলুম ভাই, আমি তো ভেঙে গড়াতেই চেয়েছিলুম, উনি দিলেন না। বলেন, ওতে শুধু সোনা নষ্ট। পুরনোটা হালকা, যেমন আছে, তোলা থাক, মেয়েদের বিয়েয় তো লাগবে।

এব পবে তিবিশ টাকার বৌয়েব তুল, আব পঁচিশ টাকাব বৌয়েব আংটি নিযে কিছু আলোচনা না করলে ভাল দেখায় না। ষাট টাকাব গিন্নী সমদর্শী, কাউকেই নিবাশ কবেন না। সবচেযে শেষে তাঁব নজব পডে তাব দিকে, পাটিব ধার ঘেঁষে সন্তর্পণে শানেব ওপব যে বসেছে।

অনুকম্পিত কণ্ঠে বলেন, তোমাব হাত দু'টি একেবাবে খালি বৌ? সধবা মানুষ, একেবাবে শাদা হাত ভাল দেখায় না। আব কিছু না হোক, দু'গাছি কেমিক্যাল চুড়ি তো গডিযে নিতে পাব।

হাত দু'খানি তাডাতাডি আঁচলেব মধ্যে টেনে নেয় মণিমালা, লজ্জায় অপমানে চোখের তাবা দু'টি জ্বলতে থাকে।

সেই আগুন বিনিদ্র বাত্রে জল হযে পল্লব, কপোল, কণ্ঠ ভিজিযে নামে। কিসে ছোট সে ওদের চেয়ে, লেখাপডায, রূপে, গুণে—কিসে।

শুধু অক্ষম, অবিবেচক একটা অমানুষের হাতে পড়েই চিরকাল তাকে আঁচল ভরে করুণা আর উপেক্ষা কুড়িয়ে যেতে হবে? ড্রেনের কাদায় ছপ ছপ করে লাফিয়ে পড়ছে ইঁদুর, নিঃশব্দ পায়ে আরশোলা ঘরময় ঘোরাঘুরি করছে, অসতর্ক একটা পতঙ্গ মাকড়সার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল, ও-পাশের তালাচাবি বন্ধ ঘরে বন্দী মেয়েটি সমানে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। নিশ্চিন্ত, সুখসুপ্ত একটি পুরুষের পাশে শুয়ে শুয়ে হতমান, কিন্তু তেজী একটি মেয়ের সর্বাঙ্গ ক্ষোভে, ঘৃণায় কঠিন হয়ে উঠল।

তেতলার আশি টাকার ঘরেও অভ্যর্থনার বিশেষ রকমফের হয় না। ভেজান দরজা ঠেলে মণিমালা দেখল, খুড়তুতো দেওরেব সঙ্গে ক্যারম খেলছে প্রফেসরের বৌ। ওকে দেখে বিশেষ প্রীত হল না, তবু খুশি-খুশি মুখে বলল, আসুন, ভাই। নীচের ঘরে খুব জমেছে বুঝি।

মণিমালা বললে, ওখানে যাইনি তো।

আশি টাকার দিদি বলেন, ষাট টাকার গিন্নী মোসায়েব জুটিয়েছেন ভাল। দোকানদার আর সাইন বোর্ডওয়ালার বৌদের সঙ্গে কী যে এত গুজগুজ ফুসফুস, বুঝিনে। একটা ভাল কথা নেই, দিনরাত শুধু পরচর্চা।

আশি টাকার দিদি নিজেও কিছু ভাগবত আলোচনা করেন না, গলা নামিয়ে বলেন, এব চেয়ে উনি নিজের মেয়েদের ওপব নজর রাখলে ভাল করতেন।

অতিশয় উৎসুক গলায় মণিমালা বলল, কী করেছে মেয়েরা?

প্রফেসর-গিন্নি হাই তুলে বললেন, কী করতে বাকি রেখেছে তাই বল। সেবারে কলেজের মেয়েদের সঙ্গে এক্সকার্সনের নাম করে স্নিগ্ধা তিন রাত্তির বাইরে কাটিয়ে এল না? কোথায় ছিল, কে ছিল সঙ্গে?

আশি টাকার দিদি কানে কানে একটা নাম বললেন। মণিমালা রুদ্ধ আগ্রহে বলল, সত্যি?

—ঠাকুরপো দেখেছে যে। সেও যে সেবারে ওখানেই এক ফুটবল টীমের হয়ে খেলতে গিয়েছিল। সব নিজ চক্ষে দেখে এসেছে।

টেবিলে ফুলদানিতে রাখা রজনীগন্ধার গুচ্ছ থেকে একটি তুলে মণিমালা ঘ্রাণ নিল। কী সুন্দর ঝকঝকে সাজান আপনার ঘরখানা, দিদি। ফুলের শখ কার, আপনার কর্তার?

আমার কর্তার ফুলের শখ? হেসে উঠল প্রফেসর বৌ। উনি একখানা ঘর বইয়ে ঠেসে রেখেছেন, পারলে এ ঘরটাও বোঝাই করে ফেলেন, আমি শুধু ঠেকিয়ে রেখেছি। ফুল নিয়ে আসে ঠাকুরপো, যুঁই, বেল, কেয়া। ছাতে কত টব লাগিয়েছে দেখেননি? এ ঘরে যা কিছু আছে সব ওর পছন্দ। এই যে বুদ্ধমূর্তি এটা তিব্বতীদের কাছ থেকে কিনেছে চল্লিশ টাকা দিয়ে।

চোখে জলের ঝাপটা দিতে আশি টাকার দিদি কলঘরে গেলেন, মণিমালা ঘুরে ঘুরে সাজান ঘরখানা দেখতে লাগল। ফুলদানি, চুলের কাঁটা, হাতি-দাঁতের চিরুনি, ফ্রেমে বাঁধান ফটো, ড্রেসিং টেবিলের আয়নার স্বচ্ছ মসৃণ কাচ। ছুঁয়েও সুখ।

আশি টাকার দিদি কলঘর থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতে গিয়েছিলেন, পিছন থেকে দেওর ডাকল, বৌদি, শোন।

আড়ালে যেতেই দেওর রুষ্ট কিন্তু চাপা গলায় বলল, ওই মেয়েমানুষ-টাকে একলা ঘরে রেখে তুমি বেরিয়ে গিয়েছিলে? কী আক্কেল তোমার। এ ঘরে আমার কত শখের জিনিস—

—কী বলছ, এত ছোট প্রবৃত্তি কি ওর হবে।

—বিশ্বাস কী। নির্দয়, কটুকণ্ঠে দেওর বলল, ভাড়া ফাঁকি দিয়ে বস্তিতে গিয়ে জুটেছে, ওদের অসাধ্য কিছু নেই।

ঘরে ফিরে এসে কিছুক্ষণ উসখুস করল আশি টাকার দিদি। ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না ভাই, ঠাকুরপো সিনেমায় যেতে বলছে। খুব ভাল কী একটা ছবি এসেছে, ম্যাটিনি-শো, টিকিট কেনাই আছে।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে মণিমালা নীচে নেমে এল। দুঃসহ গ্রীষ্মে পীচ গলে কাদা হয়েছে, নাহয় চোখ দুটো ঝলসেই গেল, কিন্তু হাঁটু দুটো ঠকঠক কাঁপে কেন।

পানে চুন দিতে কেবলি ভুল হয়ে যাচ্ছে, শুপুরি কুচোতে গিয়ে জাঁতিটা বারবার ঠেকে যাচ্ছে আঙুলে, ষাট টাকার দিদি আজ এত উত্তেজিত।

—বল কি চল্লিশ টাকার বৌ, প্রফেসর একেবারে লম্বা ছুটি নিয়ে দেশান্তরী হল, দেওরটা গেল মেসে?

—তাই তো শুনলুম, দিদি।

—আর বৌটা? ষাট টাকার দিদি উৎসুক, উত্তেজিত, তবু একটি

প্রচ্ছন্ন সুখ উপচে পড়ছে তাঁর গালের টোলে, চিবুকের তৃতীয়, অতিরিক্ত ভাঁজে।

সৌরমণ্ডলীর আজও তিনি মধ্যমণি, গ্রহ-উপগ্রহ আজও তাঁকে ঘিরে ঘন হয়ে বসেছে।

—আর বৌটা ?

—সে বুঝি গেল বাপের বাড়ি।

তিরিশ টাকার বৌ ভালমানুষী গলায় বললে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, দিদি।

পঁচিশ টাকার বৌ বললে, মেনিমুখো স্বামীকে বলিহারি যাই। নিজে পালিয়ে গেল, বৌটার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিতে পারল না ?

শুপুরি কাটা বন্ধ রেখে ষাট টাকার গিন্নী বললেন, পাখির বাসা ভাঙল তা হলে, দেমাকের ডিম ফাটল। কিন্তু আমি ভাবি, হাওয়াটা দিলে কে।

অনাহূত কুণ্ঠিত একটি ছায়ামূর্তি আজও চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়েছে, তাকে কেউ দেখেনি। চল্লিশ টাকার বৌ বললে, হাওয়া ?

—মানে কথাটা কেউ প্রফেসরের কানে তুলেছে নিশ্চয়, নইলে ব্যোম-ভোলানাথ টের পেল কি করে।

ঘরের ওপাশ থেকে বড় মেয়ে সুস্মিতা বলে উঠল, ঠিক বলেছ মা। ওথেলো নাটকেও—

ধমক দিয়ে ষাট টাকার গিন্নী বলেন, তুই চুপ কর। বড়দের কথায় আসিস কেন। ভক্তমণ্ডলীর দিকে চেয়ে বললেন, ফুলের টবগুলো এবারে ছাগলে মুড়োবে। কত শখ, কত অহঙ্কার, সব ফুরুৎ হল তো। আগে খবর পেলে চেয়ার খাটগুলো কিনে রাখতুম।

ডবল পানের এক খিলি গালে তুলে দিলেন ষাট টাকার গিন্নী, প্রসন্ন হাসি বিকিরণ করে বললেন, যাক, ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই। ওপরের ঘর ক'খানা খালি হয়ে আমার ভালই হল। আসছে মাসে স্বস্মিতার বিয়ে, অনেক আত্মীয় কুটুম আসবে, কোথায় জায়গা দেব ঠিক করতে পারছিলুম না, এবারে বাড়িওয়ালাকে বলে একটা বন্দোবস্ত করে নিতে হবে।

—সব ঠিক হয়ে গেছে, দিদি?

ম্যাগাজিনের পাতা খুলে অন্যমনস্ক হবার ভান করেছে স্বস্মিতা, সেদিকে স্নেহকটাক্ষ হেনে বড় গিন্নী বললেন, এক রকম সব। দানসামগ্রী, গহনার লিস্টি পর্যন্ত। বিলেত ফেরৎ ছেলে, নিজে মেয়ে দেখে পছন্দ করেছে, পণ বলে কিছু নেবে না তো। তা আমি অন্যদিকে দিয়ে পুষিয়ে দিচ্ছি। আসছে রবিবার ত্রয়োদশী, সেদিন পাকা দেখা, তারপর দু'হাত এক হলে আমি নিশ্চিন্তি। মেয়ের আমার কপাল ভাল, গোয়াবাগানের মিত্তির, নাম শোননি?

কবাটের আড়াল থেকে একটি ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে সরে গেল, ষাট টাকার গিন্নী চমকে উঠে বলে উঠলেন, কে? কে গেল?

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে আধময়লা, ছায়াছায়া একটা শাড়ি, চল্লিশ টাকার বৌ উঠে গিয়ে উঁকি দিয়ে ছিন্ন গুণ্ঠনের ফাঁকে রুক্ষ, পাটল বর্ণ একটি আলগা খোঁপার আভাস দেখতে পেল শুধু। ফিরে এসে বলল, বোধ হয় পনেরো টাকার বৌ।

—সেই যারা বস্তিতে পালিয়ে গেছে? কেউ ডাকে না, কেউ চায় না, রোজ রোজ ও আসে কেন।

পানের বাটা থেকে হাত গুটিয়ে গিন্নী বললেন, কী জানি, আমার ভাল ঠেকছে না। বুক ধড়ফড় করছে। সুস্মিতা, এক গ্লাস জল দে দেখি।

বিকেল থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি সন্ধ্যাকে আরও তাড়াতাড়ি ডেকে এনেছে। গলির মোড়ে গ্যাসের বাতি নিবু-নিবু, ভিতরের আঙিনায় মোটা হু'টি কণ্ঠের সঙ্গে ক্যানেস্তারার সঙ্গত; ড্রেনের ফাঁক দিয়ে ক'টা ইঁহুর কুতকুতে চোখে চেয়ে আছে। বন্ধ ঘরের ফাঁক দিয়ে শোনা যাচ্ছে একটি বন্দী মেয়ের ক্লান্ত কান্না।

থাক, সেদিকে দৃষ্টি নেই মণিমালার, বুকের নীচে বালিশ টেনে উপুড় হয়ে শুয়ে সে চিঠি লিখছে। নরম, নিভাঁজ, শাদা কাগজ, দোয়াতে একবার কলম ডোবায় মণিমালা, এক এক লাইন লেখে, গোটা গোটা হস্তাক্ষর, ফিরে ফিরে পড়ে। ঘরের কোণে তোরঙেব ওপব স্তূপ করা ভিজে কাঁথা, ছেঁড়া তোষক আব ময়লা চাদর, কলঙ্কিত চিমনির নিষ্প্রভ আলো, সবটা ভাল দেখা যায় না।

সেই আধ-অন্ধকারে সাপের মণির মত জ্বলছে একটি মেযেব চোখ, যার স্বামী উপার্জন করে না, থিয়েটারের মেয়ের হাত ধরে টানতে বাধে না যার রুচিতে, ভাড়া বাকি ফেলে বৌকে যে এনে তুলেছে বস্তিতে।

কবাটে টোকা পড়ল, মণিমালা বালিশের নীচে কাগজটা ফেলল লুকিয়ে। চকিত কণ্ঠে বলল, কে।

আবার টোকা পড়ল। কম্পিত হাতে ছিটকিনি খুলে মণিমালা এক পাশে সরে দাঁড়াল। ঝড়ের মত অন্ধবেগে যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁকে দেখে মণিমালার পলক পড়ল না।

ষাট টাকার দিদি কথা বাড়ালেন না, ওর হাত দুটি জড়িয়ে বললেন, 'আমার সর্বনাশ করো না পনেরো টাকার বৌ।' স্রস্ত বেশ, ত্রস্ত কম্পিত কণ্ঠ।

শান্ত স্বরে মণিমালা বলল, স্থির হয়ে বসুন। বলুন তো কী হয়েছে।

দ্রুত-রুদ্ধ কণ্ঠে ষাট টাকার দিদি বললেন, আমি জানি সব। জানি, আশি টাকার বৌয়ের ঘর কে ভেঙেছে। তুমি শোধ নিয়েছ। কিন্তু সুস্মিতার সর্বনাশ তুমি করো না মা, আমাকে পথে বসিও না। আমি, আমি তোমাকে পাঁচশ টাকা দেব।

বুকটা দ্রুত ওঠা-পড়া করছে ষাট টাকার গিন্নীর, দরদর ঘাম ঝরছে। অনুনয়-নত স্বরে বললেন, সুস্মিতাও এসেছে। আমরা মা-মেয়ে তোমার পা দুটি জড়িয়ে পড়ে থাকব যতক্ষণ না তুমি কথা দিচ্ছ।

মণিমালা চেয়ে দেখল, দরজার বাইরে আরেকটি ছায়া-শরীর সঙ্কুচিত হয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। গাঢ় রক্তরঙ শাড়ি পরনে, কিন্তু সুস্মিতার মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে, বিস্ফারিত দৃষ্টি।

শূন্য চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মণিমালা, ফণার মত আধ-খসা ঘোমটা, মুখের রেখা ক'টি বিস্তৃত হতে শুরু করেছে। আশি টাকার দিদির সুখনীড় ভাঙে, ষাট টাকার দিদিকে বস্তিতে টেনে আনে, তাঁর বিদুষী-রূপসী মেয়েকে লুটিয়ে দেয় পায়ের কাছে, এমন মরণকাঠি খুঁজে পেয়েছে সকলেব ছোট, সকলের করুণার উঞ্ছকুড়ুনি পনেরো টাকার বৌ।

হঠাৎ নিষ্ঠুর শুষ্ক কণ্ঠে হেসে উঠল মণিমালা। এ-বাড়িতে পা রেখেই একবার হেসেছিল, তারপর এই প্রথম।

কানাকড়ি

দরজায় বারকয়েক টোকা দিল মন্মথ, তবু খুলল না। নাম ধরে ডাকল, সাবিত্রী।

ভেতর থেকে সাবধানগলা সাড়া এল ; কে।

আমি।

দরজা খুলে গেল। সাবিত্রী বলল, এত দেরি হল তোমার। আমি তখন থেকে ভয়ে মরি। চুপচাপ তক্তপোষে পা তুলে বসে আছি। জিনিস-পত্তর কিচ্ছু গোছগাছ হয়নি কিন্তু।

গেঞ্জিটা খুলতে খুলতে মন্মথ বললে, কী করি, দু'দুটো টিউসনি ছিল যে। একটু পাখা করবে ?

খালি-গা, হাঁটু অবধি কাপড় তুলে মন্মথ পাঁচ মিনিট হাওয়া খেল কিন্তু সাবিত্রী তখন কিছু বলল না। বলল অনেক পরে, একেবারে শুতে এসে।

আজ দুপুরের কথাটা। বিকেলের দিকে গলির ঠিক মুখটাতে ট্যাক্সির হর্ণ বেজেছিল। মিনিটখানেক পরে একজোড়া মশ্‌মশ্‌ জুতো এসে থেমেছিল ওদের দোরগোড়ায়। তারপর দরজায় টোকা। কাছে পিঠে কেউ নেই, নতুন বাসা, চেনা নেই, জানা নেই, ভয়ে কাঠশরীর সাবিত্রী, ছিটকিনি তো ছিলই, তার ওপর খিল তুলে দিয়েছিল। ভাগ্যিস সেই মুহূর্তে পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল, ফিসফিস স্বরে একজন বললে, ওদিকে নয়, ইদিকে। চোখের মাথা খেয়েছ ?

মশ্‌মশ্‌ জুতো বললে, তাই নাকি, মাইরি ভুল হয়ে যায়। তুমি তৈরি ?

রেডি।

তা হলে স্টেডি—গো।

মশ্‌মশ্‌ জুতো মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে, পিছনে পিছনে খুটখুট। বোধ হয় হাই-হীল। একটু পরে গলির মুখ থেকে ট্যাক্সি ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজ এল।

মন্মথ শুনল সব, বলল, নতুন জায়গা, তাই সব তাতেই অস্বস্তি হচ্ছে। একটু চেনাজানা হোক, তখন আর এত ভয় পাবেনা।

প্রথম থেকেই সাবিত্রীর পছন্দ হয়নি। না বাসা, না গলি। আলাদা বাসার জন্যে মন্মথকে পেড়াপীড়ি করেছিল কিন্তু সে কি এমনি। বাপের বাড়ি বেহালায়, সেখানে তবু মাটির ছোঁয়া ছিল। নারকেলগাছের ছাতাধরা ছোট্ট একটু ছাত ছিল। কিন্তু আহিরিটোলার এই গলিতে আছে শুধু পীচ আর পাথর।

অবাড়ন্তশরীর মেয়েদের বয়েসের মত, এ-বাড়িতে বেলা যেন বাড়েনা। সারারাত ভ্যাপসা গরমের পর একেবারে শেষ রাতে গলির গ্যাস-আলো ক্লান্ত চোখ বোঁজে, সেই সঙ্গে মানুষও। কিন্তু ক'মিনিট। একটু পরেই সদর রাস্তায় সাড়া জাগে, গঙ্গাযাত্রীদের নিয়ে প্রথম ঢংঢং ট্রাম বেরুল। চৌবাচ্চায় ঝিরঝির শব্দ, জলের কলটা যাটনম্বর আলেকজাণ্ডার সুতোর একগাছি দাঁতে চেপে আছে।

তারপর থেকে সব বাঁধা টাইমে। বাবুরা বাজারে বেরিয়েছেন, এখন তবে সাড়ে সাতটা। কুচো চিংড়ি আর পুঁইশাকে থলে ভর্তি করে ফিরছেন : আটটা। কলতলায় মগ হাতে ঠেলাঠেলি, নাছুঁইপানি স্নান : সাড়ে আট।

নমোনমো খাওয়া : নটা। রেকাব থেকে তুলে নেওয়া মিঠে এক খিলি পান, রাস্তার দড়ি থেকে ধরান আয়েসী একটা কাঁচি—সারাদিনের বরাদ্দ ছুটির মধ্যে একটি—সাড়ে নটা, দৌড়-দৌড় দৌড়।

তারপর থেকেই গলিটা যেন ঝিমোতে শুরু করে। কোন সাড়া নেই, ক্বচিৎ একটি কাকের কা-কা, ক্বচিৎ সারাদুপুর রোদে টোটো-হয়রান ফিরিওয়ালা এ-গলিতে খদ্দের না হোক, ছায়া খোঁজে।

সাড়া জাগে শুধু একবার, সেই শেষবেলায়, গলির মোড়ে ট্যাক্সির হর্ণে। পাশের ঘরের দরজায় তিনটে টোকার ইশারা, মশ্‌মশ্‌ জুতোর পিছে পিছে মিলিয়ে যায় হাই-হীল।

আলাপ হতে হতে ছদিন কাটল।

জানালায় আয়না রেখে সাবিত্রী কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরছিল, ছায়া দেখে ফিরে তাকাল। বলল, আসুন। আপনি তো ও-ঘরে থাকেন ?

চৌকাঠের ওপর ইতস্তত দু'টি পা। সাবিত্রী দু'টি উঁচু গোড়ালি পলকে দেখে নিল।

জুতো পায়ে ঢুকবনা ভাই। বেরুচ্ছি। দু'দিন থেকেই দেখছি আপনারা নতুন এসেছেন। তা ফুরসুৎই পাইনা যে এসে পরিচয় করব। দরজা সব সময়ে তো বন্ধই দেখি। আজ খোলা দেখে এলুম।

আসুন, আসুন না ভেতরে। সাবিত্রী আবার বলল। জুতো খোলার দরকার নেই, উনি তো দু'বেলাই ঢুকছেন।

তক্তপোষে বসে মেয়েটি বলল, বাঃ! দিব্যি তো গুছিয়ে নিয়েছেন। দু'জনের সংসার।

দু'জনের না। সাবিত্রী কুণ্ঠিত হেসে বলল, তিনজন।

ওমা তাই তো। খুকিকে তো দেখতেই পাইনি। কেমন চুপচাপ ঘুমুচ্ছে। কার মত হয়েছে,—বাপের মত?

কী জানি। সাহস পেয়ে সাবিত্রী বলল, আপনারা ক'জন দিদি।

হেসে লুটিয়ে পডার ভঙ্গি কবে মেয়েটি বলল, দিদি আবাব কী। মল্লিকা। আমাকে মল্লিকাদি বলে ডাকবেন। বয়সে তো আমি বড়োই হব আপনাব চেয়ে মনে হচ্ছে।

মল্লিকাদি, সাবিত্রী জিজ্ঞাসা কবল, আপনাবা ক'জন—তিনজন না চার?

একজন ভাই। মল্লিকা বলল, এক এবং অদ্বিতীয়। দু'জন হতে পাবলাম কই যে তিনজন হব।

ওমা, আপনার বিয়ে হয়নি? কবেননি কেন।

কবিনি কি আর সাধ কবে। হল না। মল্লিকা উদাসীন ভঙ্গিতে বলল। কিন্তু আমি আব বেশীক্ষণ বসব না ভাই। বেরুতে হবে। শ্যামেব বাঁশি বাজল বলে।

শ্যামেব বাঁশি? একটু অবাক তাকিয়ে সাবিত্রী বলল, ও, ট্যাক্সিব কথা বলছেন। আপনি বুঝি খুব ট্যাক্সি চড়েন?

তা চড়ি, মল্লিকা বলল, আপনি চড়েন না?

আমি? বলতে গিয়ে চোখ দুটো যেন নিবে গেল সাবিত্রীব। আমি? আপনিও যেমন মল্লিকাদি। গবীবেব ঘবেব মেয়ে, পড়েছি গবীবের হাতে—আমি ট্যাক্সি চডেছি মোটে দু'বার। একবাব সেই বিয়েব সময়, আবেকবাব এই এবারে, মিনু হতে হাসপাতালে যেতে। সাবিত্রী ইঙ্গিতে ওব মেয়েকে দেখিযে দিলে।

নিজের কথাটা বলেই সাবিত্রী কৌতূহল সামলাতে পারল না, বলল, আপনাকে নিতে রোজ রোজ কে আসেন, মল্লিকাদি। ওই যে মশ্‌মশ্‌ জুতো, কোট, প্যাণ্ট—

ওমা, তাও দেখেছ। মল্লিকা অল্প হেসে বলল, ও হল আমার এক মামাতো ভাই। আমার হার্টের ব্যামো কিনা, তাই রোজ হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায়।

পরদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারা হলে সাবিত্রী নিজেই গেল মল্লিকার ঘরে। মল্লিকা বিছানায় শুয়ে কী একটা বই পড়ছিল, এস ভাই। কাজকর্ম চুকলো ?

চুকবে কি, সাবিত্রীর পা সরছিল না। ছোট্ট, কিন্তু এমন সাজান গুছান ঘর তার কখনো চোখে পড়েনি। ঝকঝকে পালিশ খাটের ওপর ধবধবে বিছানা, ফুলতোলা বালিশের ওয়াড়। ড্রেসিং আয়না, টি-পয়, গ্রামোফোন একটা। আলমারিতে কাচের, চীনেমাটির খেলনা কতরকম।

এগুলো ? সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল।

এগুলো পুতুল। মল্লিকা বলল, আমি খেলি যে। আমার কি পুতুল খেলার বয়স গিয়েছে ভাই।

খাটের একপাশে সাবিত্রী বসল সন্তর্পণে। নোংরা কাপড়, কী জানি। মল্লিকার হাতের বইটা দেখিয়ে বলল, কী পড়ছেন।

পৃষ্ঠা মুড়ে রেখে মল্লিকা বলল, গল্পের বই। কাল সিনেমায় যে বইটা দেখতে গেছলুম, সেটাই লিখেছে। ভারি চমৎকার। তোমাকে কী বলব ভাই, কাল দু'জায়গায় আমার চোখে জল এসেছিল।

কাল সিনেমায় গিয়েছিলেন বুঝি ?

যেতে হয়েছিল, সাধ করে কি আব গিয়েছি। আমার সারা বিকেল মাথা ধরে আছে, তবু ছাড়ল না।

কে ছাডল না দিদি ?

আবার দিদি ? বলবে মল্লিকাদি। ছাডল না আমার জ্যাঠতুতো ভাই।

আপনার জ্যাঠতুতো ভাই, মল্লিকাদি ? আপনার ছোট ?

আঙ্গুলে বয়সের হিসেব করে মল্লিকা বলল, অনেক ছোট। প্রায় দু'বছর হবে। কেন তুমি দেখনি ? সেই যে, বোজ গাডি নিয়ে বিকেলে আসে ? ও আবার সিনেমায় কাজ কবে কিনা। ডিবেক্টব।

সাবিত্রী তখন কিছু বলল না, বলল অনেক পবে মন্মথকে, গবম ভাতেব থালায় হাওযা দিতে দিতে।

না জেনে শুনে আমাকে কী একটা বাসায় এনে তুলেছ, শুনি ?

খাওয়া বন্ধ করে মন্মথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। ফিস ফিস কবে সাবিত্রী বলল, তোমাকে সেদিন বলিনি ? ও-পাশের ঘবে থাকে একটা নষ্টচবিত্তের মেযেমানুষ। আমি এখানে থাকব কী কবে বলো তো। তুমি তো বেবিয়ে যাও সাবাদিনেব মত। একটু থেমে বলল, সেদিন বলছিল মামাতো দাদা, আজ বলেছে জ্যাঠতুতো ভাই। মামাতো ভায়েবা রাতাবাতি জ্যাঠতুতো ভাই হলে আসল সম্পর্কটা কী হয়, মুখ্যু হলেও সেটুকু বুঝতে পাবি।

মন্মথ ফের মুখে গ্রাস তুলতে লাগল। বলল, তুমি বেশী মেশামেশি কবোনা। নিজে ঠিক থাকলেই হল। তোমাকে চিনি তো, খাবাপ কিছু তোমার কাছে ঘেঁষতে পাবে না।

ওর চরিত্রতেজের ওপর স্বামীর অটুট শ্রদ্ধা আছে জেনে সাবিত্রীর বুক ভরে গেল।

দুপুরে মন্মথ অফিসে বেরুচ্ছে, সাবিত্রী বলল, আজ কিন্তু বাসার খোঁজ আনা চাই।

মন্মথ বলল, আচ্ছা।

ফিরতে ফিরতে মন্মথর রাত আটটা বেজে গেল। দরজার ছিটকিনি খুলে দিয়েই সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, পেলে খোঁজ।

কিসের ?

বাসার।

জামা খুলে মন্মথ হুকে টাঙিয়ে রাখল, জবাব দিল না।

ভাত বেড়ে দিয়ে সাবিত্রী বলল, কাল যদি নতুন বাসার খোঁজ না কর, তবে আমি মাথা খুঁড়ে কুরুক্ষেত্র করব বলে রাখলুম।

বিরক্ত গলায় মন্মথ বলল, বাসার খোঁজ পাওয়া কি অত সহজ নাকি।

তাই বলে খুঁজবে না তুমি।

ডালের বাটিতে সুড়ুৎ চুমুক দিযে মন্মথ বলল, খুঁজব, খুঁজব। অত ব্যস্ত হলে কি চলে।

হাতাটা ঠং করে মেঝেয় ফেলে দিয়ে সাবিত্রী তিক্ত গলায় বলল, আমাকে একটা বেশ্যাবাড়িতে এনে তোলার সময় মনে ছিল না ?

মন্মথর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বলল, তোমাকে বেশ্যাবাড়ি এনে তুলেছি আমি ?

সাবিত্রীর চোখ দু'টো তখনো জ্বলছে। রুদ্ধস্বরে বলল, বেশ্যা ছাড়া কী। দিনরাত রঙ মাখে, সঙ সাজে, ও কী-জাতের মেয়েমানুষ আমার জানতে বাকি নেই। তুমি যদি বন্দোবস্ত না কর, আমিই করব। কালই বেহালায় চলে যাব।

ভাতের থালায় জল ঢেলে দিয়ে মন্মথ বলল, তাই যাও। তবু যদি সেখানে কী সুখ আমার জানতে বাকি থাকত। বাপ নেই, মা ছেলেবৌয়ের কাছে চোর হয়ে আছে। ভাইয়ের ছেলের কাঁথাবদলান থেকে ভাজের কাপড়কাচা অবধি সব কাজ করতে হয়নি সেখানে? দু'বেলা হেঁসেল ঠেলা, আর ঠেস দেওয়া কথা শোনা। দু'খানা শোবার ঘর পর্যন্ত নেই। শনিবার শনিবার আমি যেতাম, শুতে দিত চিলে কুঠিতে, বুড়ি মা বারান্দায় ঠাণ্ডায় শুয়ে শুয়ে কাশত। তখন তুমি কেঁদে কেঁদে ইনিয়ে বিনিয়ে বলোনি আমাকে আলাদা বাসা করতে? বলোনি, এখান থেকে যেমন করে হোক আমাকে নিয়ে চল। তোমার সঙ্গে না হয় গাছতলাতে থাকব, সেও সুখ? ও কথাগুলো কি থিয়েটারে শিখে এসে মুখস্থ বলেছিলে।

একটা মাদুর নিয়ে সাবিত্রী আলাদা শুতে যাচ্ছিল। মন্মথ বলল, খাবেনা তুমি?

উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ ঢেকে সাবিত্রী চাপাকান্নাভাঙা গলায় বলল, আজ আমাকে বাপের বাড়ির খোঁটা দিলে তুমি। আমি জলটুকুও ছোঁব না।

ছোঁবে না?

না।

থাকো তবে। একটা বালিশ নিয়ে মন্মথ বাইরের ঘরে শুতে গেল।

পরদিন ঘুম ভেঙে দেখল, সারা গা ব্যথাব্যথা। ঘরে এসে আয়নায় দেখল চোখ দু'টি লাল। সাবিত্রীর ইতিমধ্যে স্নান সারা হয়ে গিয়েছিল। এক পেয়ালা চা এনে মন্মথর সমুখে রেখে চলে যাচ্ছিল, মন্মথ ডাকল, শোন।

ভিজে চুল, খোলা, তখনো সিঁদুর পরেনি, সাবিত্রীর কপাল প্রাক্‌সকাল আকাশের মত স্নিগ্ধ, নিষ্প্রভশুভ্র। বালিশে মুখ লুকিয়ে সারারাতকাঁদা চোখ দুটিতে করুণ ক্লান্তি। মন্মথ অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল, কোন কথা বলতে পারল না। সাবিত্রী মাটির দিকে অপলক চেয়ে আছে। মন্মথ অনেকক্ষণ পরে ডাকল, সাবিত্রী।

সাবিত্রী চোখ তুলে তাকাল। পাতা দু'টি কেঁপে উঠল একবার, একটু ভিজল, ঠোঁট দুটি থরথর হল। উঠে গিয়ে মন্মথ সামনে দাঁড়াল সাবিত্রীর, একখানা হাত কাঁধের ওপর রাখল। সরে যেতে চাইল সাবিত্রী, হাতখানা সরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু সরতে গিয়েও সরতে পারল না, আরো বেশী করে ধরা পড়ল, ঢলনামা মুখ ডুবিয়ে দিল মন্মথর বুকে।

পরক্ষণেই হাসিকান্না মুখখানা তুলে বলল, একি, তোমার গা এত গরম।

মন্মথ সামান্য হাসল।

সাবিত্রী বলল, কাল আবার রাগ করে বাইরে শোয়া হয়েছিল। আজ অফিসে যেতে পারেনা তুমি।

মন্মথ বলল, ও কিছুনা। অফিসে যেতেই হবে। তুমি বাসাবাসা করে পাগল হয়ে আছ, তাই তোমাকে বলিনি। আমাদের অফিসে ছাঁটাই হচ্ছে। এ-সময়ে সবাই ভয়ে ভয়ে আছে। গরহাজির হলে গোলমাল হতে পারে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সরে গেল সাবিত্রী। সশঙ্ক স্বরে বলল, তোমারও চাকরি যাবে নাকি।

যেতে তো পারেই। আমদানী রপ্তানীর ওপর আমাদের অফিস, মাল আসছে না নিয়মিত বিদেশ থেকে। পাকিস্তানেও চালান যাচ্ছে না।

একটু চুপ করে থেকে মন্মথ আবার বলল, দু'দিন একটু চুপ করে থাকো। চাকরির ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক। এর মধ্যে আর নতুন বাসার হাঙ্গামা করে কাজ নেই। একটু নিচু গাঢ়গলায় মন্মথ বলল, আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু ভেতরটা আমাদের খাঁটি। নিজেদের নিজেরা সন্দেহ করে যেন ছোট না করি। আমাকে তুমি চেন, আমিও জানি তুমি কী। আমাদের দু'জনের কাছে দু'জনের দাম থাকলেই হল।

বাজারেব থলি হাতে মন্মথ বেরিয়ে যাচ্ছিল, সাবিত্রী ডাকল, এই শোন।

মন্মথ ফিরে তাকাল। সাবিত্রী বলল, গেঞ্জিটা ছেড়ে দিয়ে যাও, ওটা পরে আর বাইবে যায় না। লোকে বলবে কী।

সিঁদুরে চোখের জলে বুকের কাছটাতে মাখামাখি। মন্মথ একটু হেসে গেঞ্জিটা খুলে দিল।

একটু পরেই মল্লিকা এসে দাঁড়াল দরজায়। মিটি মিটি হেসে বলল, কাল রাত্তিরে বুঝি কত্তাগিন্নীতে ঝগড়া হয়েছিল?

সাবিত্রী লজ্জিত গলায় বলল, কই, নাতো।

ইস, আবার লুকোন হচ্ছে।

আপনি কী করে জানলেন।

হাত গুনতে জানি যে। ঘরে খড়ি পেতেছিলাম। না ভাই, খড়ি নয়, আড়ি। কাল আড়ি পেতেছিলাম তোমাদের দরজায়! সাবিত্রী তবু

বিশ্বাস করছেনা দেখে মল্লিকা বলল, কাল তোমার কত্তাকে রকে ঘুমোতে দেখলাম কিনা, তাই। শেষ শো'তে থিয়েটার দেখেছি কাল, ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। দেখছ না চোখ দু'টো ফোলাফোলা, ভাল ঘুম হয়নি কিনা তাই। একটু থেমে মল্লিকা বলল, কাল তোমরাও তো ঘুমোওনি। চোর এলে কিন্তু মুসকিলে পড়ত ভাই। বলে মল্লিকা হাসল।

কিন্তু সাবিত্রী হাসল না। সেই লজ্জাটুকু ঢাকতে মল্লিকাকে একটু বেশি করে হাসতে হল।

এড়াতে চাইলেও সব সময় এড়ান যায় না। এক বাসায় থাকতে গেলে দু'চারবার মুখোমুখি হতেই হয়, মিষ্টি হেসে মিষ্টি হাসির শোধও দিতে হয়। বিশেষ, মল্লিকা যেদিন একবাটি মাংস নিয়ে রান্নাঘরের সমুখে এসে দাঁড়াল, সেদিন আর সাবিত্রী না বলতে পারল না। একটুখানি চেখে বলল, চমৎকার হয়েছে মল্লিকাদি।

মল্লিকা বলল, বুনো পাখি। শশাঙ্করা বাইরে গিয়েছিল, শিকার করে এনেছে। ভারি চমৎকার স্বাদ না ?

শশাঙ্কই যে মল্লিকার সেই জ্যাঠতুতো কিম্বা মামাতো ভাই, সাবিত্রী জানত। চুপ করে রইল, কিছু বলল না।

মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ কী রাঁধলে ভাই ? কী মাছ, দেখি।

সেদিন বাজার থেকে মাছ আসেনি, কিন্তু মাথা কাটা গেলেও সাবিত্রী সে-কথা স্বীকার করতে পারবে না। বলল, দেরিতে বাজার এসেছে, এ-বেলা

বেশি কিছু হয়নি মল্লিকাদি, অল্প চারটি খেয়েই অফিসে গেছেন। ও-বেলার জন্যে রেখে দিয়েছি বাঁধাকপি আর মাছের মুড়ো।

চলে যেতে যেতে মল্লিকা বলল, ও-বেলা আমার এক বাটি চাই কিন্তু।

মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল সাবিত্রীর মুখ। তখন থেকে কেবলি প্রার্থনা করেছে, হে ঠাকুর, আজ যেন উনি একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফেরেন, কিন্তু মন্মথ ফিরল সাতটা বাজিয়ে।

ঘরে ঢুকেই মন্মথ জামাটা ছাড়তে যাচ্ছিল, সাবিত্রী সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, খুলোনা। তোমাকে এখুনি বাজাব যেতে হবে।

বিস্মিত বিরক্তগলায় মন্মথ বলল, কেন।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এল সাবিত্রী। সন্তর্পণ গলায় বলল, একটা বাঁধা কপি আনবে, আর একটা মাছের মুড়ো।

মন্মথ বিদ্রূপ করে বলল, হঠাৎ এত শখ যে। এত খাবার সাধ— পোয়াতি হলে নাকি আবার ?

সাবিত্রী বলল, চুপ চুপ, আস্তে। সাধ নয় গো মান। আমার মান বাঁচাতে পার একমাত্র তুমি। তারপর সাবিত্রী ফিস ফিস করে সব কথা বলল। শুনে কঠিন হয়ে গেল মন্মথর মুখ। কী ফ্যাসাদ বাধিয়ে আছ বল তো। মাসের শেষ, হাতে পয়সা নেই, শেষ রেশনটা বাদ দেব কিনা ভাবছি, তার ওপর এসব কী পাগলামি। তোমাকে বারবার বলিনি, আমরা দু'জনকে নিয়ে দু'জন, কারুর কাছে ছোট হব না, তাই বলে ছোট কাজও করব না কখনও, কেন কেন তুমি পাল্লা দিতে চাও অন্যের সঙ্গে ?

মন্মথর হাত দু'খানা চেপে ধরল সাবিত্রী। ধরা গলায় বলল, আর

করব না। কিন্তু আজকের মত আমাকে বাঁচাতেই হবে। না-হয় কোন হোটেল থেকে একবাটি কিনে নিয়ে এস। কম খরচে হবে।

হাত ছাড়িয়ে মন্মথ তীক্ষ্ণস্বরে বলল, পাগলামি ক'রনা। আমি এখন যাই, হোটেলে হোটেলে খোঁজ নিইগে কোথায় বাঁধাকপি দিয়ে মাছের মুড়ো রাঁধা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত, মন্মথ কিন্তু টিফিন ক্যারিয়ারের একটা বাটিতে বাঁধাকপির ঘণ্ট জোগাড় করে আনলও। অনেক রাতে, শুতে এসে সাবিত্রী বলল, হোটেলের রান্না, মল্লিকাদি কিচ্ছু টের পায়নি কিন্তু! খুব সুখ্যাতি করছিল।

সেদিন দুপুর থেকেই মল্লিকার ঘর-সাজানর ঘটা দেখে সাবিত্রী অবাক হয়ে গেল। যেখানে যত ঝুল ছিল, সব সাফ করেছে মল্লিকা, বালতি বালতি জল ঢেলে মেঝে ধুয়েছে। খাটটা ছিল ঘরের মাঝখানে, সেটাকে টেনে এনেছে এক কোণে। ঘষে ঘষে পরিষ্কার করেছে আয়নার কাঁচ। ফুলদানীতে টাটকা তাজা ফুল, জাজিমের ওপর ধবধবে চাদর।

কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে গায়ে মুখে মাথায় সাবান মেখেছে মল্লিকা, বারান্দায় সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা। সাবিত্রী সারাক্ষণ উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখছে মল্লিকার কাজ। বলল, আজ যে এত ঘটা মল্লিকাদি?

মল্লিকা মুচকি·হাসল। বলল, জানোনা? আজ যে আমাকে দেখতে আসবে ভাই। তা কেউ তো নেই, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করছি।

সাবিত্রী বলল, ঠাট্টা!

কেন আমাকে বুঝি দেখতে আসতে পারেনা? আমার বিয়ের বয়স কি একেবারেই গিয়েছে ভাই? দেখতো কেমন টান টান চামড়া, ধবধবে রঙ, মল্লিকা সামনে হাত দু'খানা প্রসারিত করে ধরল।

অপ্রতিভ সাবিত্রী বলল, তা কেন, তা কেন। সত্যি করে বলুন না, মল্লিকাদি, কে আসবে আজ।

আমার ক'জন বন্ধু। নেমন্তন্ন করেছি আজ। এখুনি এসে পড়বে ওরা।

তারপর কতক্ষণ ধরে যে মল্লিকা আয়নার সমুখে বসে বসে, প্রসাধন করল। সাবান দেওয়া চুল ফাঁপিয়ে দিল খোঁপাবাঁধার এক নিপুণ কৌশলে। একটু রঙ, একটু পাউডার ক্রীম মিশিয়ে তৈরি করল অপরূপ ত্বকপ্রলেপ, ভ্রুরেখাকে দীর্ঘায়ত করল তুলিকায়। হারমোনিয়মের নিখুঁৎ সাজান রীডের মত দাঁতের পাঁতি বার করে যখন হাসল, সাবিত্রী মুগ্ধ হয়ে গেল।

একটু পরে বলল, আপনার বন্ধুরা এসে পড়বেন। আমি এখন যাই, মল্লিকাদি।

মল্লিকা বলল, আহা, ব'সনা।

তখনও ঘর সাজান একটু বাকি ছিল, মল্লিকা এটা-ওটা এখানে সেখানে সরাতে লাগল, টুলের ওপর বসে মেয়েকে দুধ দিতে দিতে সাবিত্রী দেখতে থাকল নির্নিমেষে।

ঠিক সেই সময়ে বারান্দায় মশ্‌মশ্‌ জুতোর শব্দ শোনা গেল, আজ এক সঙ্গে অনেক জোড়া। পালাবে কি, দরজা তো মোটে একটা। মাথার কাপড় সামলাতে গিয়ে গায়ের কাপড় আলগা হয়ে পড়ল, পায়ের দিকে তাকাতে গিয়ে নজরে পড়ল গোড়ালির ওপরেও খানিকটা জায়গায় উপযুক্ত প্রচ্ছদ নেই।

খুকিকে একরকম জোর করেই দুধ ছাড়াল সাবিত্রী, মেঝেয় শুইয়ে দিল, ব্লাউজের বোতামগুলো পটপট করে বন্ধ করল কোনক্রমে। খুকিকে কোলে

নিয়ে দৌড়তে যাবে, চৌকাটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে শশাঙ্ক, একেবারে মুখোমুখি।

না-জানি আজ একটা গোটা আতরের শিশিই, ফিনফিনে পাঞ্জাবি আর রুমালে শশাঙ্ক উজাড় করে এসেছে, গন্ধে সাবিত্রীর গা-বমিবমি অনুভূতি এল। চৌকাট ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াল শশাঙ্ক, সেই ফাঁকটুকু দিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েও সাবিত্রীর মনে হল ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল বুঝি। অসম্বৃত গিলেআস্তিন আদ্দির জামাটা বুঝি সেটেই রইল আঁচলে, হীরে ঠিকরান আঙুলের শর বিঁধে রইল পিঠে, ঠিক যেখানটায় ব্লাউজটা ফেঁসে গেছে।

তা ছাড়া ঘরে এসেও সাবিত্রী ভুলতে পারল না শশাঙ্কর চাউনি। কী আতুর, আচ্ছন্ন চোখে চেয়ে ছিল লোকটা। পাতেব পাশে বসে থাকা বেড়ালটা যে-আগ্রহে বাটিব গা চেটে চেটে খায়, চুষে চুষে খায় মাছের কাঁটা, তেমনি। সাবিত্রী সারাশরীর ভরে শিহরণ অনুভব করল।

শনিবার, মন্মথ সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ফিরল। ঘবে পা দিয়েই একরকম চেঁচিয়ে উঠল, কী হচ্ছে, কী হচ্ছে ও-ঘরে।

সাবিত্রী বলল, একটু আস্তে কথা বলতে পারোনা? গান। মল্লিকাদি গান গাইছে। ও-ঘরে আজ কত লোক এসেছে জান।

ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেল মন্মথর মুখ। জানালা দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিতে দিতে বলল, ছি-ছি-ছি। ওরা বড় বাড়াবাড়ি শুরু করলে দেখছি।

খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে সাবিত্রী বলল, ঘুঙুরও বাজছে না?

মন্মথ তখন ভেন্টিলেটর দুটোও বন্ধ করে দেবে কিনা ভাবছে। বলল, ওসব শুনে কাজ নেই।

এক একবার গান থামে, সাবিত্রী বলে, এই বুঝি ওদের আসর ভাঙলো। কিন্তু ভাঙেনা। একটা শেষ হতেই এক পশলা হাততালির তারিফ শোনা যায়, পরক্ষণেই হারমোনিয়মটায় নতুন সুর ককিয়ে ওঠে।

মন্মথ বলল, কী কেলেঙ্কারি। এই তবে পেশা তোমার মল্লিকাদির। এতদিনে পরিষ্কার বোঝা গেল। ছি-ছি পেটে খাবার জন্যে কত ছোট কাজই না করে মানুষ। বলতে বলতে মন্মথর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, আমাদের কিন্তু গর্ব আছে সাবিত্রী, উপোস করে শরীর শুকিয়ে মরলেও ভেতরের মানুষটাকে নীচু করিনি। কালই বাড়িওয়ালাকে বলব আমি। একটা বিহিত করতে হবে।

সাবিত্রী ভেবেছিল মল্লিকা পরদিন মুখ দেখাতে পারবে না ওর কাছে। আশ্চর্য, পরদিন কলতলায় মল্লিকাই সেধে কথা বলল।

এমন বেহায়া মেয়ে, বলল, কাল কেমন গান শুনলে ভাই।

সাবিত্রী কোন জবাব দিল না।

মল্লিকা বলল, উঃ, কী ধকল গেছে কাল। থামতেই চায় না। একটা শেষ হতে আরেকটার ফরমাস করে।

সাবিত্রী বাঁকাগলায় বলল, কাল যারা দেখতে এসেছিল, তাদের আপনাকে পছন্দ হয়েছে মল্লিকাদি?

কুলকুচির জল সশব্দে দূরে ছিটিয়ে সশব্দে হেসে উঠল মল্লিকা। ওমা, তুমি এখনো ঠাট্টার কথাটা মনে রেখেছ? আমাকে দেখতে তো আসেনি। শীগ্‌গিরই আমরা একটা গীতিনাট্য অভিনয় করব কিনা, কাল আমার ঘরে তার মহলা হ'ল। আসছে পূর্ণিমায় শো। নাট্যপীঠ থিয়েটারও ভাড়া নেওয়া হয়েছে জান?

সাবিত্রী নীরবে কাপড় কাচতে লাগল। মল্লিকা হঠাৎ কাছে ঘেঁষে এল। সাবিত্রীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, তুমি কিন্তু একটু সাবধানে থেক ভাই। কাল শশাঙ্ক তোমাকে একেবারে পষ্ট সামনাসামনি দেখেছে। কী বলব, ওর মাথা ঘুরে গেছে একেবারে। ওরা এবারে যে ফিলিমটা তুলছে, তাতে নাকি ছোট্ট একটি মায়ের পার্ট আছে। খুকিকে তুমি দুধ দিচ্ছিলে না—ঠিক অমনি একটা পোজ ওদের চাই।

সাহস পেয়ে আরো কত কী বলত মল্লিকা ঠিক নেই, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সাবিত্রী দুমদাম পা ফেলে উঠে গেল। মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, তুমি মরো মল্লিকাদি।

রবিবার বাড়িওয়ালার কাছে যাই-যাই করেও মন্মথ আলসেমি করে সারাদিন বাসায় কাটিয়ে দিল। সোমবার অফিসফেরৎ যাবার কথা ছিল, সেদিন বেলা তিনটের সময়ই সটান চলে এল বাড়ি। কোনোদিকে না চেয়ে সোজা ঘরে গিয়ে তক্তপোষে শুয়ে পড়ল।

মেঝেয় আঁচল পেতে শুয়েছিল সাবিত্রী, ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল, একি, এত শীগগির ফিরলে আজ? তাহলে আজ সিনেমায় নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

কঠিন চোখে তাকাল মন্মথ। বলল, হ্যাঁ। সেইটেই বাকি আছে। সিনেমা দেখারই সময় আমাদের।

ভয় পেয়ে আরো কাছে ঘেঁসে এল সাবিত্রী। মন্মথর কপালে উদ্বিগ্ন করতল রাখল; ভিজে হাত গরম ঠেকল, কিন্তু নিশ্চিত বোঝা গেলনা, তখন গাল কাৎ করে রাখল মন্মথর কপালে। বলল, জ্বর হয়নি তো।

পাশ ফিরে সরে গেল মন্মথ। বিষণ্ণঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল, জবাব আমার কপালে লেখা নেই, সাবিত্রী, জামার বুক পকেটে আছে। উঠে গিয়ে দেখ।

অফিসের ছাপমারা লেপাফা দেখে সাবিত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। খাম না খুলেই বলল, এ কী, ছাঁটাই ?

মন্মথ এ-প্রশ্নের জবাব দিল কনুই দিয়ে চোখ ঢেকে।

মল্লিকা উঁকি দিয়ে বলল, ওমা, খুকিকে এখুনি ভাত দিয়েছ, ভাই ? বয়স কত ওর—দাঁত উঠেছে ?

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলল, উঠেছে দিদি, ওপরনীচ মিলিয়ে ছ'টা। ভীষণ পেটের অসুখ যে ওর, তাই ভাবছি আজ দুধ দিয়ে কাজ নেই।

মল্লিকা মুখ টিপে হাসল : কলকাতার দুধ তো সিকিটাই জলমেশান, পাথরভর্তি চালের চেয়ে সেটা পেটের পক্ষে ভালই হত সাবিত্রী।

মুখ টেপার রকম দেখে সাবিত্রীর সারাশরীর জ্বলে গেল। মনে মনে বলল, বেশ্যা, হারামজাদি।

সন্ধ্যার পর নিজেই একটা দরখাস্তর মুসাবিদা করছিল মন্মথ, আপনমনে হাসছিল। সাবিত্রী পাশে এসে বসল। মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল, হাসছ যে। আজ কোথাও কোন আশা পেয়েছ ?

মন্মথ বলল, না। আজ আলফ্রেড এণ্ড জ্যাকসন কোম্পানীর বড়বাবুকে কেমন জব্দ করেছি সেই কথাই ভাবছি।

সাবিত্রী উৎসুক চোখে চেয়ে আছে দেখে মন্মথ গল্পটা বলল : আরে না-কামান গাল আর খালি পা দেখে ব্যাটা তো কথাই বলতে

চায় না। বলে বেয়ারার কাজ নেই বাপু, অন্যত্র দেখ। চট করে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বললুম, বেয়ারার কাজ চাইনে স্যার, ক্লারিকাল। আমি সাত বছর সিমসন জোসেফের বাড়ি ক্লার্কের কাজ করেছি। আমার চেহারা আগাগোড়া দেখে নিয়ে—চোখ নয় তো শালার, যেন বুরুশ—বড়বাবু বললে, তুমি! বললুম, ভদ্রলোক স্যার, দস্তুরমত আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট। জ্যাঠামশায় মারা গেছেন স্যার, তাই···। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভঙ্গি বদলে গেল বেটার। বললে, অশৌচ কেটে যাক, একটা দরখাস্ত নিয়ে আসবেন। দেখি ছোটসাহেবকে বলে কিছু করতে পারি কিনা। মন্মথ হো-হো কবে হাসতে লাগল।

নিয়ে যাও তবে দরখাস্ত? সাবিত্রী বলল।

আরে সেইখানেই তো মুশকিল। দরখাস্ত তো কালই নিয়ে যেতে পারি। না হয় দু'আনা খরচ কবে দাড়ি কামিয়ে বললাম, শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল স্যার। কিন্তু পা দু'খানা মুড়ি কী দিয়ে।

অনামিকা থেকে নিঃশব্দে বিযেব আংটিটা খুলে সাবিত্রী মন্মথব হাতে দিল। মন্মথ কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলল, কালই একজোড়া জুতো কিনবে তুমি।

সাবিত্রী চায়না, না ঘেঁসতে, না মিশতে,'তবু কি কম্‌লি মল্লিকা ছাড়ে। মন্মথ বেরিয়েছে টের পেয়েছে কি এ-ঘরে এসে বসবে। বিব্রত, বেআব্রু করবে সাবিত্রীকে একটার পর একটা রঞ্জনরশ্মি প্রশ্নে।

গায়ে যে বড় একটাও জামা রাখনি, সাবিত্রী?

কুন্ঠিত সাবিত্রী আরো জড়োসড়ো হয়ে বসতে চেষ্টা করে বলে, বড় গরম যে মল্লিকাদি ?

গরম ? হাসালে ভাই তুমি আমাকে। চারদিন থেকে সমানে বিষ্টি, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া, আমরা রাত্তিরে চাদর গায়ে দিচ্ছি, তবু তোমার গরম গেলনা। অবাক করলে ভাই। এ-গরম তোমার বয়সের।

মল্লিকার গলাটা টিপে ধরলে, নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে বুঝি রাগ যেত সাবিত্রীর। কিন্তু উপায় নেই। মুখ ফুটে কাউকে বলা যাবেনা কিছু। গোপন ঘায়ের মত লুকিয়ে রাখতে হবে এই দুঃখ ; এই অনটন, যা অনশনের সোদর। কিন্তু পুঁজেরক্তে ছেঁড়া কাপড়খানাও যে মাথামাথি হয়ে গেল, সাবিত্রী লুকোবে কী।

মল্লিকা বলল, আজ দুপুরে একটু বেরুব। ঘরখানার ওপর একটু নজর রেখো। সেই কথাই তোমাকে বলতে এলুম।

কোথায় যাবে, সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করেনি, মল্লিকা নিজেই বলল।

রেসে যাব ভাই। শশাঙ্করা খুব ধরেছে। সারাদিনের ধকল, শরীরে কি এত সয়! দম নিয়ে ফের বলল, তা শশাঙ্ক বাহাদুর ছেলে বলতে হবে। জিতিয়ে দেবে কিন্তু তোমাকে ঠিক। পাঁচটাকায় পাঁচশো। সেই যে ম্যাজিক আছে না, ধূলোমুঠো সোনা হয়ে যায় ? এ তাই।

পাঁচ টাকায় পাঁচশো, মল্লিকাদি ?

ওই কথার কথা। তা তেমন তেমন ঘোড়া মিললে হয় বৈকি। আর তিন টোটের খেল মেলাতে পারলে তো কথাই নেই,—রাতারাতি বড় মানুষ।

সাবিত্রীর চোখ দু'টো জ্বলছিল। মল্লিকা বলল, অবাক হয়ে চেয়ে আছ যে।

সাবিত্রী শুকনো গলায় বলল, এমনি।

কিন্তু মল্লিকা বেরিয়ে যেতেই সাবিত্রী চালের হাঁড়িতে হাত দিল! বেরুল টিনের একটা কৌটো, সেই কৌটোর মধ্যে ন্যাকড়ার একটা পুঁটলি। গিঁট খুলতে ছড়িয়ে পড়ল পয়সা, সব শুদ্ধ সওয়া পাঁচ আনা। মন্মথর চাকরি হলে কালিঘাটে পূজো দেবে বলে কবে যেন সাবিত্রী আলাদা করে রেখেছিল।

মল্লিকার তখনো সাজগোছ সারা হয়নি, সাবিত্রী গিয়ে দাঁড়াল। আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে, মল্লিকা তখন কণ্ঠায়, ঘাড়ে, কনুই অবধি পাউডাব মাথছে। ফিরে তাকিয়ে বলল, কী ভাই।

সাবিত্রী অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না। তারপর সঙ্কোচ জয় করে নীচু গলায় বলল, কম পয়সায় রেস খেলা যায় না, মল্লিকাদি?

মল্লিকার চোখে মুখে কৌতুক ছড়িয়ে পড়ল, বলল, কত কম পয়সা, ভাই?

এই ধরো,—স'পাঁচ আনা?

স'পাঁচ আনা কেন,—পাঁচ আনাতেই চলবে। আমাব চেনা বুকি আছে কত; তুমি খেলবে?

কুণ্ঠিত, কাঁপা হাতে সাবিত্রী মল্লিকার হাতে পাঁচ আনা গুঁজে দিল। মল্লিকা বলল, ঘোড়া?

সাবিত্রী বলল, ওসব আমি বুঝিনে, তোমাব যা ভাল মনে হয়, কবো, মল্লিকাদি।

সেই পাঁচ আনা সুদে-আসলে ফিরে এল কিন্তু। মল্লিকা বলল, তোমাব ভাগ্য ভাল সাবিত্রী। আমরা এলোমেলো খেলে ফতুর, কিন্তু তোমাব নামে যেটা ধরলুম, সেটাই বাজি নিলে। তবে পেমেণ্ট ভাল হয়নি, নামী ঘোড়া কিনা। পাঁচ আনায় পেয়েছে আট আনা।

আমার এই ভাল মল্লিকাদি, সাবিত্রী আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললে।

চায়েব সঙ্গে ফুলুবি বেগুনী দেখে মন্মথ অবাক হ'ল। পয়সা পেলে কোথায় তুমি ?

যেন কতই রহস্য, সাবিত্রী এমন ভঙ্গিতে হাসল।

চাকবিব দবখাস্ত লিখে লিখে আব জবাব না পেয়ে পেয়ে মেজাজ আজকাল সর্বদাই তিবিক্ষি মন্মথর, স্ত্রীব কাছেও জবাব না পেয়ে চটে গেল, রোজগাব কবেছ নাকি ?

তবু হাসল সাবিত্রী। —যদি বলি তাই।

ঠা।কটু গলায মন্মথ বলল, আশ্চর্য হব না, জলজ্যান্ত আদর্শ যখন পাশেই বয়েছে।

কথাব ধরণে সব উৎসাহ মিইযে গিযেছিল সাবিত্রীব, তবু মন্মথকে সব কথা খুলে বলতেই হল।

অন্ধকাব হলে গেল মন্মথেব মুখ। গম্ভীব স্ববে বলল, এও তো এক হিসেবে তোমাব বোজগারই। ছি-ছি। তোমাকে বলিনি সাবিত্রী, ও-সবে কাজ নেই। না খেযে থাকব সেও স্বীকাব, তবু তোমাব উপার্জন খেতে চাইনে।

কার্তিক মাসের গোড়াতে সাবিত্রী বাপের বাড়ি গেল। ইচ্ছে ছিলনা, শুধু মন্মথব পেড়াপীড়িতে। সাবিত্রী বাববাব বলেছে, আমাব কিচ্ছু ক্ষতি হবেনা দেখো। তা ছাড়া, আমাদেব এখন এই তুঃসময চলেছে। কার কাছে তোমাকে বেখে যাব।

মন্মথ বলেছে, সে-ভাবনা ভাবতে হবেনা তোমাকে। এ-অবস্থায় এত খাটুনি সহ্য হবেনা, তার ওপর পেট ভরে দুবেলা খেতেও পাওনা। শেষ পর্যন্ত একটা বিপদ বাধাবে? আর, কদিনের জন্যেই বা। তোমার হিসেব মত তো আর সাড়ে পাঁচ মাস?

কিন্তু ঠিক পঁচিশ দিনের মাথায় সাবিত্রী ফিরে এল, ফ্যাকাশে, শাদা কাঠি। কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠেছে, পেট চুপসে ছুঁয়েছে পিঠ।

মল্লিকা বলে, ছেলে কোলে করে আসবে ভেবেছিলাম, তা এ কী চেহারা নিয়ে এলে, ভাই?

সাবিত্রী বলল, ও-শত্তুর না এসেছে ভালই হয়েছে মল্লিকাদি। এলে খাওয়াতাম কী।

কী হয়েছিল রে।

কিচ্ছুনা। শরীরটা এখান থেকেই খারাপ নিয়ে গিযেছিলাম তো। রোজই ঘুষঘুষে জ্বর হত। ওখানে গিয়ে কলতলায় মাথা ঘুরল একদিন,—ব্যাস।

শরীরটা দু'দিন একটু সেরে এলেই পারতে।

সাবিত্রী চুপ করে রইল।

মন্মথ দিনকতক ঘোরাঘুরি করছে। ব্যবসা করছে বলে। বাপের বাড়ি যাবার আগেই সাবিত্রী শুনে গিয়েছিল, এক বন্ধুর প্রেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে মন্মথ, কাজ দিলে কমিশন। লক্ষ্মীর কৌটো কুড়িয়ে কাচিয়ে বেরিয়েছিল পাঁচ টাকা, খুদ বিক্রী করে আরো দেড়। একটা ট্রামের মান্থলি কিনেছিল মন্মথ।

একদিন দুপুরে মন্মথ খেয়ে দেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ছে দেখে সাবিত্রী বলল, কী গো, আজ কাজে যাবেনা?

মন্মথ হাই তুলে বলল, দূর, দূর। শুধু ঘোরাঘুরি, শরীরটাই মাটি।

কাজ দিতে পারনি তোমার বন্ধুর প্রেসে ?

দিয়েছি তো। মন্মথ খাটের নিচে রাখা লেটার হেডের স্তূপ দেখিয়ে দিল, ওগুলো দেখতে পাওনি ? চক্রবর্তী এণ্ড দত্ত,—অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

কোন্ কোম্পানী ?

কোম্পানী আমি নিজেই। দত্ত নামটা দিয়েছিলাম মনগড়া। শুধু একটা নাম কেমন ন্যাড়ান্যাড়া শোনায় বলে। ওগুলো কাল সের দরে বেচে দিও।

আরেকটা কাজের কথা অনেক দূর এগিয়েও হলনা। কোন একটা ফার্মের ট্রেড রিপ্রেসেণ্টেটিভ। কলকাতার বাইরে যেতে হবে মাঝে মাঝে। একশো টাকা মাইনে, রাহা খরচা, উপরন্তু বিক্রীর ওপর দু' পারসেণ্ট কমিশন। সে-অফিসের মাঝারি একজন কেরানীকে পান খেতে কিছু হাতে গুঁজেও দিয়ে এসেছিল। নির্দিষ্ট দিনে দেখা করতে গেল মন্মথ। ফিরে আসতে সাবিত্রী বলল, হল ?

না। মন্মথ বলল, জোচ্চোর শালা জোচ্চোর—পাঁচশো টাকা জমা রাখতে চায়। আরে তোদের মাল নিয়ে কি সরে পড়তাম আমি ? এটুকু বিশ্বাস করতে পারিস না ?

মন্মথ বলতে বলতে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যেন সাবিত্রীই জামিনের টাকা চেয়েছে। যেন সাবিত্রীই ওকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

অন্য লোক নিয়েছে ওরা ?

আরে সেই কথাই তো বলছি। যাকে নিয়েছে সে আবার আমার চেনা, প্রভাস গাঙ্গুলী। সেদিন বিয়ে করেছে কিনা, নগদ নিয়েছিল ছ' হাজার, বলামাত্তর পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল।

কোন কাবণ নেই, তবু সাবিত্রী মাথা নীচু করল। ওব বাবা শুদ্ধ-মাত্র শাঁখা সিঁদুরে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন, সেই আপশোষই মন্মথ করছে না তো এতদিন পরে, কোলে একটা আসবার পবে, এমন কি আবও একটা নষ্ট হয়ে যাবাব পরে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়, কিন্তু শাক ঢাকবে কী দিয়ে। আব মল্লিকা এমন সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে যে লুকোবার উপায় নেই।

মল্লিকা বললে, এত শীগগিব আজ খেতে বসেছ ভাই?

পাতে শুধু কলমী শাক সেদ্ধ, আর কয়েকদানা মাত্র ভাত। অন্যদিন হলে সাবিত্রী তাড়াতাড়ি জল ঢেলে দিত থালায়। কিম্বা বলত, আজ তোমাব ভগ্নিপতিব তাড়াতাড়ি কাজ ছিল দিদি, বাজারটাও করে দিয়ে যেতে পাবেনি; তা, আমাবও শবীব ভাল নেই, দু'টো দাঁতে কাটছি শুধু।

নিজেব ঘরে গিয়ে ছোট একটা বাটিতে মাছেব ঝোল নিয়ে ফিবে এল মল্লিকা। একটু চেকে দেখবে ভাই, নুন দিয়েছি কিনা বুঝতে পাচ্ছিনা।

অত্যন্ত সহজ ছল, অন্যদিন হলে অপমান বোধ করত, মল্লিকাকে ফিরিয়ে দিত, কিন্তু আজ কী হল সাবিত্রীব চোখ দুটো ছল ছল কবে উঠল। কত ভুল না কবে মানুষ, কত অকারণে একে অপবকে ঠেলে বাখতে চায় দূরে। পাশের ঘরেব এই মেয়েটিকে কেন বরাবর অপছন্দ কবে এসেছে সাবিত্রী? ওর কাছে আসল পবিচয় লুকিয়ে বাখতে চেষ্টা কবছে বলে? অকস্মাৎ সাবিত্রীব মনে হল সেও তো মল্লিকাব কাছে কম কথা লুকোয়নি। মল্লিকা গোপন কবতে চেয়েছে ওর কলঙ্কেব কুলো, সাবিত্রী ওর অভাবের

ফুটো কলসী। এতদিন পরে সাবিত্রী প্রথম অনুভব করল একই পৈঠায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

বুক ঠেলে খানিকটা লবণাক্ত কান্না ছাপিয়ে পড়ল সাবিত্রীর চোখে।

সেদিন সাবিত্রী একটা অসমসাহসিক কাজ কবল।

তেমন কিছু বোদ নেই, তবু চোখ দু'টো গরম, কান ঝাঁঝাঁ করছে। অনভ্যস্ত পায়ে বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে শাড়ি। ধারকবা স্যাণ্ডালটার স্ট্রাপ যেন চামড়া কষে ধরেছে।

একা পথ চলার অভ্যাস নেই, ভয় ছিল ঠিক চিনতে পারবে কিনা। মল্লিকা ভাল করে বুঝিয়ে দিযেছিল, বিশেষ অসুবিধা হ'ল না।

ঘড়িতে দেখল তখনো সিনেমা শুরু হতে মিনিট পোনেরো দেরি। ধপ কবে একটা কৌচে বসে পড়ল সাবিত্রী। মল্লিকার দেওয়া গন্ধ রুমালে মুখের ঘাম মুছল।

কিছুই লুকোয়নি আজ মল্লিকাব কাছে। মন্মথর চাকরি না থাকার কথা; অভাবেব কথা; উপোস দেওয়ার কথা। সব অহংকার, অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে বলেছে, তোমার পায়ে পড়ি মল্লিকাদি, যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে দাও। নিজের জন্যে ভাবিনা। কিন্তু চোখের ওপর মেয়েটা শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, সহ্য হয় না।

কী-কাজ করবে তুমি ?

তাই-তো, কী কাজ। না-জানি ভাল লেখাপড়া, না সেলাই। টীচার হতে পারবে না, নার্স না, দর্জি না। কথাবার্তায় তুখোড় নয় যে টেলিফোনে

কাজ নেবে। অসীম প্রয়াসে সংকোচ জয় করে সাবিত্রী বলেছে, আচ্ছা সেদিন যে কাজটার কথা বলেছিলে সেটা হয় না? সেই যে সিনেমায়, ছোট্ট একটা পার্ট, মায়ের? শশাঙ্কবাবুকে একবারটি বলে দেখনা মল্লিকাদি।

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল মল্লিকা। দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আমি বললেও হবে; কিন্তু তার চেয়েও একটা সহজ উপায় আছে। কিন্তু সে কি তুমি রাজি হবে ভাই।

রাজি? হাসতে গিয়েও চোখ দুটো আবার ভারি হয়ে এল সাবিত্রীর। ভিখিরির আবার বাছবিচার। আমার কিছুতেই ভয় নেই মল্লিকাদি। তুমি বল।

মল্লিকা বলল। সাবিত্রী এত যে আগ্রহ দেখিয়েছিল, তবু প্রথমটা কোন কথা বলতে পারল না। মল্লিকা জোর দিয়ে বলল, অন্যায় কিছু করতে বলছি না তো, শুধু পাশে গিয়ে বসবে। আমার নামে টিকিট তো কেনাই আছে। আমি জোর করে বলছি সাবিত্রী, আমি বললে যা হত, এতে তার চেয়ে দশগুণ ফল হবে। নিজের কাজ নিজেকেই গুছিয়ে নিতে হয় ভাই।

কী সম্মোহন ছিল মল্লিকার অকম্প স্বরে, অপলক চোখে, সাবিত্রীর অন্তস্তল অবধি কেঁপে উঠল। কুয়োর গভীর তলদেশে নির্জীব একটা কণ্ঠ যেন ভেসে উঠল: বেশ আমি রাজি, মল্লিকাদি। টিকিটখানা দাও।

তারপর চলে এসেছে এই ছায়ালোক বায়োস্কোপে। মন্মথ বেরিয়ে গেছে। তার অনুমতি দেওয়ার অপেক্ষা পর্যন্ত করেনি।

আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক পাশে এসে বসল। গদি-আসনে সারা শরীর কেঁপে উঠল সাবিত্রীর, জড়োসড়ো হয়ে বসল। বিস্মিত শশাঙ্কই প্রথম কথা বলল, আপনি?

মল্লিকাদির শবীর খারাপ। আসতে পাবলেন না। টিকিটটা নষ্ট হবে, তাই আমাকে—

অন্ধকার ঘবে পর্দার ওপবে ততক্ষণ ছবির নডাচড়া শুরু হয়ে গেছে। কী কথা বলছে ওবা, প্রেক্ষাগৃহে কখনো তুমুল হাসি, কখনো স্তব্ধতা। সেদিকে তো চোখ নেই সাবিত্রীব, সেদিকে কান নেই। গলা শুকনো, দেহ আডষ্ট, চোখে জ্বালা। এই বুঝি নিবালোকতাব সুযোগে এগিযে এল একখানি বোমশ হাতেব ছোবল। এই বুঝি ওব কোমব জডিলে ধবল একটি দুঃসাহসী লালসা। যতবার শশাঙ্ক নডেচডে বসল, ততবার ভয়ে অন্যদিকে সবে গেল সাবিত্রী; কতবাব যে পাশেব হাতলে অন্যমনস্ক হাত বাখল, কতবাব যে তুলে নিল, হিসেব নেই। একবাব খসখস কবে উঠল, মনে হ'ল শশাঙ্কব বাঁহাত কী যেন খুঁজছে এদিকে। প্রাণপণ প্রয়াসে শরীবটাকে শক্ত কবল সাবিত্রী, মনটাকে প্রস্তুত কবল, এমন সময় ফশ্ করে আলো জ্বলে উঠল। আড়চোখে চেয়ে সাবিত্রী দেখল শশাঙ্ক একটা সিগাবেট ধবিয়েছে। বাঁ ধারের পকেটে এতক্ষণ দেশলাইয়ের বাক্স খুঁজছিল।

বুকের ভেতব থেকে রুমাল বাব কবে সাবিত্রী সন্তর্পণে কপালেব ঘাম মুছল।

বিরতির আলো জ্বলতে উঠে গেল শশাঙ্ক, একটু পবে দু'টো আইসক্রীম নিযে ফিবে এল। একটা সাবিত্রাব হাতে দিয়ে বলল, কেমন লাগছে।

ঘাড কাৎ কবে সাবিত্রী অস্ফুটস্বরে কী বলল, নিজেই শুনতে পেলনা।

বুঝতে পাবছেন? প্রোগ্রাম কিনে দেব একটা?

সাবিত্রী বলল, না।

কী অসুখ হয়েছে মল্লিকার।

থতমত খেয়ে সাবিত্রী বলল, বেশি কিছু না। এই—এই মাথাধরা আর কী।

আবার আলো নিবল। আবার সেই ছাইছাই ফিকে অন্ধকার, পর্দায় মুখর ছবির অবিরাম গতি, সেই দমবন্ধ ভয়, ঘামঘাম অস্বস্তি। কিছু বুঝলনা সাবিত্রী, বুঝতে চাইলনা, পালা করে হাতলে হাত রাখল, তুলে নিল, সরে বসল, সরে এলও, বারবার একটা অগ্রসব পরুষ হাতের স্পর্শ কল্পনা করে নিজের হৃৎপিণ্ডের ধ্বক ধ্বক শব্দ শুনল।

শেষ বারের মত আলো জ্বলতে সব লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রচালিতের মত সাবিত্রী অনুসরণ করল শশাঙ্ককে, বাইরে আসতে পাঁচমিনিটের বেশি লাগল।

শশাঙ্ক বলল, কিছু খাবেন ?

না-বলতে গিয়েও সাবিত্রী কিছু বলতে পারল না, ওর কথা বলার ক্ষমতাই লোপ পেয়েছে। পর্দা ঠেলে একটা ছোট কামরায় বসল দু'জনে। শশাঙ্ক বলল, কী আনতে বলব।

অস্বচ্ছন্দ শুকনো গলায় সাবিত্রী কোনমতে বলল, এক গ্লাস জল।

শুধু জল ? তা কি হয়। শশাঙ্ক কিছু খাবারও ফরমাস করল।

যতক্ষণ সিনেমার মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সাবিত্রী লক্ষ্য করেছে, ভয় করেছে শশাঙ্কের হাত দু'খানাকে ; এবারে খাবারের টেবিলের তলা দিয়ে ওর পা দু'খানার দিকে নজর পড়ল। মিহিগিলে কোঁচাটা শুঁড়ের মত

লম্বা হয়ে একজোড়া চকচকে কালো নিউ-কাটের গন্ধ শুঁকছে। সেই মশ্‌মশ্‌ জুতো। সাবিত্রী কাঁপল, পা দু'খানার নিম্নতম প্রান্ত অবধি শাড়িতে ঢেকেও স্বস্তি হলনা, টেনে নিল চেয়ারের নিচে। তবু যেন চোখ বুঁজে অনুভব করল আরেক জোড়া পা নিঃশব্দে, গুটিগুটি এগিয়ে এসেছে; নতুন স্যাণ্ডালের ফিতেয় পায়ের পাতার যেখানটা কেটে গিয়ে জ্বালা করছে, তার ওপর সাবিত্রী যেন বারবার কঠিন একজোড়া নিউ-কাটের চাপ অনুভব করল।

শশাঙ্ক বলল, আপনার বুঝি সিনেমা দেখার বিশেষ অভ্যাস নেই?

এতক্ষণে সাবিত্রী সম্বিৎ ফিরে পেল। হঠাৎ মনে পড়ল, আসল কাজই বাকি রয়ে গেছে। যে জন্যে এত আয়োজন করে আসা, সেই কথাটাই বলা হয়নি শশাঙ্ককে।

বলল, না। আপনারা—আপনি তো খুব দেখেন, না?

আমি? আমাকে তো দেখতেই হয়। আমি সিনেমায় কাজ করি জানেন না?

ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। চায়েব পেয়ালায শশাঙ্ক চুমুক দিচ্ছে আস্তে আস্তে। একটু পরেই বিল নিয়ে এসে দাঁড়াবে বয়। যা বলবার আছে সাবিত্রীর, এই বেলা।

তবু কি সোজাসুজি বলতে পারল। প্রথমে জিজ্ঞাসা করল স্টুডিও সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক খবর। কেমন করে তোলা হয় ছবি, কথা গাঁথা হয় কি-করে। তারপর শুনতে চাইল, কী-কী ছবি উঠছে এখন।

শশাঙ্ক বলল, একখানা মোটে। তাও কাজ এগোচ্ছে না। বাজার খারাপ। বারবার মার খেয়ে এ-ব্যবসা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে সবাই।

নিজে থেকে শশাঙ্ক প্রস্তাব করবে, সে আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে! বিল চুকিয়ে দিতে শশাঙ্ক পাঁচটাকার একখানা নোট দিয়েছে, খুচরো পয়সা এখুনি ফেরৎ নিয়ে আসবে বয়। আর সময় নেই।

মরীয়া হয়ে সাবিত্রী বলল, মল্লিকাদি বলছিলেন,—আপনাদের ছবিতে নাকি—নাকি একটা পা-পার্ট খালি আছে। লোক খুঁজছেন আপনারা।

স্মিতচোখ দু'টির ওপরে শশাঙ্কর ভ্রূজোড়া সন্নিহিত হয়ে এল: মল্লিকা বলেছে আপনাকে? কবে?

কিছুদিন আগে। জলে নেমে আর শীত নেই সাবিত্রীর। মাথা নীচু করে বলে যেতে লাগল, আমাদের বড় অভাব, শশাঙ্কবাবু। তাই ভাবছিলাম, আমি যদি···আমাকে যদি—

সিগারেট বার করে দেশলাইয়ের বাক্সে সজোরে বারবার ঠুকল শশাঙ্ক। বলল, বড্ড দেরি হয়ে গেছে, সাবিত্রী দেবী। মল্লিকাকে যখন বলেছিলাম তখন স্বাভাবিকভাবে মায়ের পার্ট করতে পারে এমন একজনকে খুঁজছিলাম আমরা। তা কাজচালান গোছের একজনকে দিয়েই সেরেছি। সে-বই তো তোলা হয়ে গেছে, এখন মুক্তিপ্রতীক্ষায় আছে।

সাবিত্রী বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু শেষ বাজি ধরার মত স্বরে বলল, আপনাদের নতুন ছবিতে কোন পার্ট খালি নেই?

আছে। কিন্তু মায়ের পার্ট তো নেই। একটি হিরোয়িন খুঁজছি আমরা। কিন্তু,—সাবিত্রীর মাথা থেকে পা অবধি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শশাঙ্ক বলল, কিন্তু, ক্ষমা করবেন, সাবিত্রী দেবী, সে পার্ট আপনাকে দিয়ে বোধ হয় হবে না।

শশাঙ্কর চোখে নিজের চেহারার ছায়া স্পষ্ট দেখতে পেল সাবিত্রী। লজ্জার জোয়ারে সমস্ত রক্ত এসে জড়ো হল মুখে, পরমুহূর্তের ভাঁটায় আবার সব শুকিয়ে কাগজসাদা হয়ে গেল। চুল উঠে যাওয়া প্রশস্ত কপাল, কালো রেখার পরিখার আড়ালে বসে-যাওয়া দু'টি নিষ্প্রভ চোখ, গালের উঁচু হাড়, প্রকট কণ্ঠাস্থি, শিরাবেরুনো লিকলিকে হাত, সমতল বুকের কবরে দু'টি বোঁটায় স্তনের এপিটাফ; এ-চেহারা হিরোয়িনের সাজেনা, এ-কথা শশাঙ্ক চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে খেয়াল হল, এই আশ্চর্য।

শশাঙ্ক বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, এবার কিছু করতে পারলাম না। তবে আপনার কথা আমার মনে থাকবে। পরের ছবিতে যদি সুবিধে হয়, খবর দেব।

একটা গাড়িও করে দিতে চেয়েছিল শশাঙ্ক, সাবিত্রী নেয়নি। দ্রুত পায়ে ফিরে আসতে আসতে দোকানের ঘড়িতে সময় দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন, খুকি হয়ত উঠে খুব কান্নাকাটি করছে। মন্মথ নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরেছে অনেকক্ষণ, সাবিত্রীকে না দেখে মুখ ওর কালো হয়ে গেছে। আজ আর রক্ষা নেই। মনশ্চক্ষে সাবিত্রী দেখতে পেল, দাঁতে ঠোঁট চেপে মন্মথ ঘরময় পায়চারি করছে, দু'হাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ। সাবিত্রীকে দেখে কী করবে মন্মথ? মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবে? বার করে দেবে গলাধাক্কা দিয়ে? ওর হুকুম না নিয়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ানর অপরাধের জন্যে চেঁচামেচি, কেলেঙ্কারি করবে?

ঝোঁকের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল যখন, তখন এ-সব সম্ভাবনার কথা একবারও মনে হয়নি ! সর্বনাশ হতে হলে মেয়েমানুষের কত মতিচ্ছন্নই না হয়।

দরজা খোলাই ছিল। খুকিকে বুকের উপর শুইয়ে মন্মথ ছড়া শুনিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সাবিত্রী কাপড় ছাড়ল, তখনো বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে।

সিনেমা ভাঙল ?

কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে সাবিত্রী চুপ করে রইল।

মন্মথ হাসিমুখে বলল, আরে, জানি জানি। এসে দেখি তোমার মল্লিকাদি খুকিকে লেবেঞ্চুস্, বিস্কুট দিয়ে ঠাণ্ডা করছে। ওর কাছেই শুনলাম।

পরম প্রশান্ত মন্মথর মুখ, কী নিরুত্তাপ কণ্ঠ। পায়ের নখ দিয়ে মেঝে ঘষতে লাগল সাবিত্রী। এর চেয়ে মন্মথ সোজাসুজি ধমক দিলনা কেন, এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপের চেয়ে আঙুল দিয়ে গলা টিপে ধরলেও ভাল ছিল।

মন্মথ বলল, ভাল, ভাল। জুজু-বুড়ি হয়ে না থেকে নিজের পথ নিজে দেখছ, খুব ভাল। নীচু স্বরে বলল, তা সুবিধে হল কিছু। শশাঙ্ক কিছু বলল ?

কী বলবে ?

এই ধর কাজের কথা। কত রকম জানাশোনা ওদের, তোমাকে একটা কাজ তো জুটিয়ে দিতে পারত ? তা তুমিও কিছু বললে না ?

না।

হঠাৎ সোজা হয়ে মন্মথ বিছানায় উঠে বসল। কঠিন গলায় বলল, তবে গিয়েছিলে কেন। নিজেব দরকারের কথা ভাল করে না বললে লোকে বুঝবে কেন ?

অত ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলার আমার অভ্যাস নেই।

মন্মথর বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। —অভ্যাস নেই! নেকি! কচি খুকি! নাক টিপলে দুধ গলে, না ? কিসে নিজের ভাল হয়, তাও বোঝনা ?

শান্তস্বরে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, কিসে ?

সে কথার জবাব না দিযে মন্মথ বলল, শশাঙ্ক তোমাকে বাড়ীতেও পৌছে দিযে যেতে চাইল না ?

চেযেছিল। আমি বাজি হইনি।

চে-য়ে-ছি-ল। বা-জি হ-ই-নি। সাবিত্রীব কথাটারই প্রতিধ্বনি করে মন্মথ মুখ ভেংচে উঠল ; রাজি হওনি কেন ?

হলেই কি মান থাকত তোমার।

মান ধুযে জল খাও, পেট ভববে। তীব্রস্বরে মন্মথ বলল, কী ক্ষতি হত তোমাব, শশাঙ্ক যদি গাডী কবে বাড়ি পৌছে দিত ?

পলক পডছে না, মণি দুটো জ্বলছে মন্মথব। সেই অগ্নিদৃষ্টির সঙ্গে চোখ মেলাতে গিয়ে সাবিত্রী চমকে উঠল। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, মন্মথ ঠাট্টা করছেনা, সত্যিই বুঝি সে চেয়েছিল সাবিত্রী শশাঙ্কব সঙ্গে এক মোটরে আসুক।

একটু ছোঁযাছুঁযিব ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিল হোক।

মন্মথ বলে যেতে লাগল, ওবা আমুদে লোক, একটু ফুর্তি চায। খুশি হলে উপকারও কবে। শুচিবাযুব বাডাবাডি করে সব মাটি করলে ?

ছুটে গিয়ে সাবিত্রী হাত চাপা দিল মন্মথর মুখে, তোমার পায়ে পড়ি, চুপ কর। বলে আর অপেক্ষা করল না, টলতে টলতে পাশের ঘরে এসে মল্লিকার বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। মল্লিকা পাশে এসে বসল তাড়াতাড়ি। কী হয়েছে সাবিত্রী, অমন করছ কেন।

জবাব শোনা গেল না। উপস্থিত কান্না বোধেব প্রাণপণ প্রযাসে সাবিত্রীর কণ্ঠ বিকৃত হয়ে গেছে। ওব পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মল্লিকা বলল, কী হয়েছে ভাই, আমাকে খুলে বল। সিনেমায না জানিয়ে গিয়েছিলে বলে খুব বুঝি বকেছেন মন্মথবাবু ?

মাথা নেড়ে সাবিত্রী জানাল, না।

তবে ? কানের কাছে মুখ নামিয়ে মল্লিকা ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, তবে বুঝি সিনেমার হলে শশাঙ্ক বেশি বাড়াবাড়ি কিছু কবেছে ?

বালিশে মুখ ডুবিয়ে সাবিত্রী তেমনি মাথা নাড়ল, তাও না।

তবে ?

এ তবেরও জবাব পেলনা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদেই চলেছে সাবিত্রী। কী করে বোঝাবে কোথায় কাঁটা। এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কর কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে, আর মন্মথের কাছে ভেতরের মানুষটাব। মল্লিকাকে কেন, কাউকে কোনদিন বলা যাবেনা, কত বড় দু'টো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।